একটি ভ্রমর
পাঁচটি ফুল
কাসেম বিন আবুবাকার

প্রকাশনায়
সাহিত্যমালা
৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর-১৯৯২
দ্বিতীয় প্রকাশঃ মে-১৯৯৪
তৃতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ-১৯৯৫

প্রচ্ছদ অংকনে
এম, আর্ট
বাংলাবাজার, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
বরেন্দ্র কম্পিউটার
৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

মুদ্রণে
ইউনির্ভাসেল প্রেস
আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

দাম
সাদা কাগজে—৭০.০০ টাকা
নিউজ কাগজে—৫০.০০ টাকা

ভূমিকা

পরম দাতা-দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।

এই উপন্যাসখানা একজন বড় সরকারী অফিসারের জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাহিনীটিকে সুখপাঠ্য ও রোমান্টিক করার জন্য যা কিছু করার তা আমি করেছি। তবে মূল কাহিনীর কোন পরিবর্তন করি নাই। ভদ্রলোক আমার বইয়ের একজন ভক্ত পাঠক। ঠিকানা জোগাড় করে হঠাৎ একদিন আমার বাসায় আসেন। আলাপ করার সময় এক পর্য্যায় বল-লেন, আপনার বইগুলো সব বাস্তবধর্মী। আপনার অনুমতি পেলে আমি একজনের এমন ঘটনাপঞ্জি শোনাতে পারি, যা পাঠ করে পাঠকবর্গ আনন্দ-বেদনা তো পাবেনই, সেই সঙ্গে সমাজের অনেক বাস্তব চিত্র জানতে পারবেন। আমার অনুমতি নিয়ে তিনি যে কাহিনী শোনালেন, তা সত্যিই অবর্ণনীয়। একটা ছেলে কিভাবে ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে লেখাপড়া করে মানুষ হল এবং সেই সঙ্গে তার জীবনে পাঁচটি মেয়ের আগমন অত্যন্ত ট্র্যাজেডিপূর্ণ ও রোমান্টিক। এটা যে তার নিজের কাহিনী আমি তা বুঝতে পারলাম। কাহিনীটির মধ্যে যে কথাটা সব থেকে মুল্যবান তা হল মানুষ কোনদিন ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের ইচ্ছামত কিছু করতে চাইলে অথবা পেতে চাইলে, তা সে যেমন করতে পারে না তেমনি পেতেও পারে না। ভাগ্যে যা লেখা থাকে তাই করে থাকে ও পেয়ে থাকে।

আশা করি পাঠকবর্গ এই কাহিনী পড়ে আনন্দ-বেদনার সাথে মূল্যবান কথাটা উপলব্ধি করতে পারবেন, এবং সমাজের বাস্তব চিত্র দেখে কিছু জ্ঞানও পাবেন।

ওয়াসসালাম

লেখক-

৫ই জুলাই ১৯৯২ইং

এক

বাংলাদেশে আটষট্টি হাজার গ্রাম। কে কটার খোঁজ রাখে। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক অবস্থানের গুণে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। আবার কিছু সংখ্যক কোন নামকরা মনীষীর জন্মভূমি হিসাবে। এই উপন্যাস যে গ্রামের ছেলেকে নিয়ে রচিত, সেই গ্রামে কোন নামকরা মনীষী জন্মগ্রহণ না করলেও অনেক আগে বৃটিশদের নজরে পড়ে। তারা উক্ত গ্রামের কয়েকজনকে স্কলারশীপ প্রদান করে এই গ্রামের সুনাম লিপিবদ্ধ করে।

কুমিল্লা টু চাঁদপুর বাস রোড আছে। আবার কুমিল্লা-লাকসাম-চাঁদপুর রেল লাইন ও আছে। লাকসাম থেকে চাঁদপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে ষ্টেশনগুলোর মধ্যে হাজিগঞ্জ প্রসিদ্ধ। ইহা ডাকাতিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এটা একটা প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বৃটিশ সরকার অফিস বসিয়ে অত্র অঞ্চলের খাজনা আদায় করত। হাজিগঞ্জ থেকে তিন মাইল উত্তরপূর্ব কোনে বলিয়া গ্রাম। এই গ্রামের যে কজন ছেলে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে স্কলারশীপ নিয়ে লেখাপড়া করেছে, তাদের মধ্যে নোয়াব আলি ১৯১৯ ইং সালে স্কলারশীপ নিয়ে এন্ট্রাস পাশ করেন। পরে তিনি রংপুর ল্যান্ড রিকুইজেসান অফিসে বেশ কিছুদিন চাকরি করেন। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়েদের মধ্যে গোলমাল হওয়ায় সম্পত্তি রক্ষা ও দেখাশুনা করার জন্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ীতে চলে আসেন।

নোয়াব আলির চার ছেলে। তাদের মধ্যে তৃতীয় ছেলের নাম মকবুল। মকবুল ছোটবেলা থেকে ধর্মভীরু, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। তার শারীরিক গড়ন ও নম্র ব্যবহারের জন্য সকলেই তাকে আদর করে। নোয়াব আলি ও উনার স্ত্রী নূর বানুর খুব

ইচ্ছা, মকবুলকে মানুষের মত মানুষ করবেন। সেই জন্যে উনারা ছেলেকে প্রথমে হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করলেন। কাছাকাছি মাদ্রাসা না থাকায় চার পাঁচ মাইল দূরের মাদ্রাসায় মকবুলকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ছোট ছেলে বলে কেউ লক্ষ্য রাখতে চায় না। তাই এতটা পথ প্রতিদিন যাতায়াত করতে মকবুলের বেশ কষ্ট হতে লাগল।

কিছুদিন এভাবে যাতায়াত করার পর মকবুলের ভীষণ জ্বর হল। তিন চার সপ্তাহ জ্বরে ভুগে খুব রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়ল।

নূরবানু স্বামীকে একদিন বললেন, অতদূরে মকবুলকে আমি পড়তে যেতে দেব না।

নোয়াব আলি বললেন, ধারে কাছে যখন তেমন কোন ভাল মাদ্রাসা নেই তখন আর কি করা যাবে। কিছুদিন যাক, স্বাস্থ্য ভাল হলে না হয় পড়তে যাবে।

মকবুলের মন লেখাপড়া করার জন্য খুব অস্থির হয়ে উঠল। মাদ্রাসায় পড়তে ইচ্ছা থাকলেও যাতায়াতের কষ্টের জন্য তার আর সেখানে পড়তে যেতে মন চাইল না। একদিন সে বাড়ীর অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে গেল। ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সব ছেলে মেয়েরা ক্লাসে গিয়ে বসল। মকবুলের ও তাদের সঙ্গে গিয়ে বসতে ইচ্ছা করল। কিন্তু সাহসে কুলাল না। সে হেড মাষ্টারের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্রামের আবু কেরানী একটা দরকারে হেড মাষ্টারের কাছে গিয়েছিলেন। মকবুলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, কি রে তুই ক্লাসে যাস না কেন?

মকবুল বলল, আমি তো এই ইস্কুলের ছাত্র না।

ঃ তাহলে এসেছিস কেন?

মকবুল তখন তার মনের কথা বলল।

ঃ তুই তা হলে এখানে পড়তে চাস?

ঃ জী।

ঃ কোন ক্লাসে পড়বি?

ঃ ফোরে।

ঃ তুই তো মাদ্রাসায় পড়তিস, ফোরের পড়া পারবি?
ঃ পারবো। আব্বা আমাকে প্রতিদিন ঘরে বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও ধারাপাত পড়ান।
আবু কেরানী হেড মাষ্টারকে জিজ্ঞেস করে ক্লাস ফোরের হাজিরা খাতায় নাম তুলে দিয়ে বললেন, যা ক্লাসে গিয়ে বস। প্রতিদিন স্কুলে আসবি আর মন দয়ে পড়াশুনা করবি।
মকবুল জী তাই করবো বলে ক্লাসে গিয়ে চাচাতো ভাই বসিরের পাশে বসল।
সেদিন ছিল নভেম্বর মাসের তিন তারিখ। ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা। মকবুল চিন্ত করল, আব্বা আম্মাকে স্কুলে ভর্তি হবার কথা এবং বই কিনে দেবার কথা বললে রাজী হবেন না। তাই সে তার চাচাতো ভাই বসিরকে পাঁচ টাকা দিয়ে চুক্তি করল, তার বই পড়ে এ বছর পরীক্ষা দেবে। তারপর সে নিয়মিত স্কুলে যাতায়ত ও বসিরের সঙ্গে পড়াশুনা করতে লাগল। এসব ব্যাপার মকবুলের বাবা মা জানতে পারলেন না।
বার্ষিক পরীক্ষায় মকবুল কয়েক বিষয়ে নিরানব্বই নাম্বার পেয়ে ফার্স্ট হল।
স্কুলের হেড মাষ্টার ও অন্যান্য মাষ্টাররা মকবুলের রেজাল্ট দেখে খুব অবাক হলেন। তারা বলাবলি করলেন, মাত্র দেড় মাস পড়াশুনা করে যে ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করতে পারে, সে ছেলে ভবিষ্যতে নিশ্চয় স্কলার হবে।
রেজাল্ট বেরোবার দিন হেড মাষ্টার মকবুলের বাবাকে ডেকে পাঠিয়ে তার রেজাল্ট দেখিয়ে বললেন, আপনার ছেলে খুব ভাল ছাত্র। একে ক্লাস ফাইভের বইপত্র কিনে দিন।
নোয়াব আলি ছেলেকে বাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলে যেতে দেখেছেন। মনে করতেন, ছোট ছেলে সারাদিন টো টো করে ঘোরার চেয়ে ওদের সঙ্গে স্কুলে ভাল থাকবে। কিন্তু সে যে এই কয়েকদিনে এত ভাল রেজাল্ট করবে চিন্তাই করতে পারছেন না। হেডমাষ্টারের কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে সেই ব্যবস্থা করব।
বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে ছেলের রেজাল্টের কথা বলে হেড মাষ্টারের কথা ও বললেন।

নূরবানু খুশী হয়ে বললেন, ওর আর মাদ্রাসায় যাওয়ার দরকার নেই, স্কুলেই পড়ুক।

মকবুলের রেজাল্টের কথা স্কুলের ও গ্রামের ছেলেরা জানতে পেরে সেই থেকে তাকে নাইনটি নাইন বলে ডাকতে শুরু করল।

মকবুল ক্লাস ফাইভে প্রথম গ্রেডে বৃত্তি নিয়ে পাশ করল। তারপর হাজিগঞ্জ হাই স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হল। গ্রামের ছেলে শহরের স্কুলে এসে যে অবস্থার শিকার হয়, মকবুলের ও তাই হল। ক্লাসের ছেলেরা কেউ বড় একটা কথা বলত না, মিশতো না। সে পিছনের বেঞ্চে বসত। ষান্মাষিক পরীক্ষায় সব বিষয়ে হায়েষ্ট নাম্বার পেতে শিক্ষকদের সুনজরে পড়ল। সেই সঙ্গে ক্লাসের অনেক ছেলে তার সাথে মেলামেশা করতে আরম্ভ করল।

ক্লাস সেভেনে ফার্ষ্ট হয়ে উঠার পর মকবুল একটা ভাল বাড়ীতে লজিং পেয়ে গেল। স্কলার বাবার মান মর্য্যাদা রক্ষা করে সে ক্লাস টেনে উঠল। ভাগ্য যাদের প্রতিকুলে, শত চেষ্টা করেও তারা আশানুরূপ সীমায় পৌছাতে পারে না। এস. এস. সি পরীক্ষার পনের দিন আগে লজিং বাড়ীতে মকবুলের পক্স হল। খুব সিরিয়াসভাবে না হলেও মাথার ও সমস্ত শরীরের যন্ত্রনায় সে অস্থির হয়ে পড়ল। এত কষ্টের মধ্যেও পড়াশুনা বন্ধ করল না। সেই অবস্থাতেই সমস্ত শরীরে চাদর জড়িয়ে মকবূল পরীক্ষা দিল। মকবুলের সেই সময় খুব ভয় হয়েছিল, যদি পরীক্ষা কেন্দ্রের কেউ তার পক্স হবার কথা জানতে পারে, তাহলে হয়তো তাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না। সকলে ভেবেছিল মকবুল নিশ্চয় স্কলারশিপ পাবে। কিন্তু তার পক্স হবার কথা শুনে সন্দিহান হয়ে দুঃখ প্রকাশ করল। তবু পরীক্ষার রেজাল্ট খুব খারাপ হল না, ফার্ষ্ট ডিভিসানে পাশ করল।

১৯৬৯ সালে পাশ করে সেই বছরই কুমিল্লা কলেজে ভর্তি হল। ঐ বছর শেখ মুজিবর রহমান নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৭০ সালে গণভোট হয়। ভোটের সময় ছাত্র, শিক্ষক, আবাল বৃদ্ধা বণিতা সকলে নৌকার ক্যানভাসে গা ভাসিয়ে দেয়। মকবুলও তাদে সঙ্গে মিশে যায়। শেখ মুজিবর রহমান নিরঙ্কুশ ভোট পেয়ে জয় লাভ করলেন। কিন্তু তৎকালীন

পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবর রহমানের হাতে ক্ষমতা দিতে চাইল না। তাই ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ সৈন্য বাহিনী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা নির্বিচারে গণহত্যা করে চলল।

মকবুল লজিং ছেড়ে বাড়ী চলে এল। নোয়াব আলি খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। পাক সেনারা বেশীরভাগ যুবকদের মুক্তিবাহিনী মনে করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কেউ আর ফিরে আসে না। কোনদিন মকবুলকে ধরে নিয়ে যায় সেই চিন্তা করে নোয়াব আলি একদিন তাকে বললেন, তোমার এখন বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নয়। তুমি অন্য কোথাও আত্মগোপন করে থাক।

মকবুল ও এইসব দেখে শুনে তাই ভাবছিল। আব্বার কথা শুনে বলল, আমি শ্রীমঙ্গলে খালার কাছে চলে যাই।

নোয়াব আলি বললেন, বেশ তাই যাও। সেখানে ও খুব সাবধানে থাকবে।

মকবুল পরের দিন শ্রীমঙ্গলে চলে এল। কয়েকদিন পর খালুকে বলল, এমনি বসে বসে কতদিন খাব। আমাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিন।

মাস খানেকের মধ্যে মকবুলের খালুর সুপারিশে ফুড ডিপার্টমেন্টের এক কেরিং কন্ট্রাকটারের অধীনে চাকরি পেল। তার কাজ হল, শ্রীমঙ্গল রেল স্টেশনের ওয়াগান থেকে চাল, গম ও চিনি রিসিভ করে সিলেট, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ ও শেরপুর সি,এস,ডি, গোডাউরেনর ওসি, এল, এসডিকে মাল বুঝিয়ে দেওয়া। ইতিমধ্যে পাক বাহিনী দেশের আনাচে কানাচে দিনরাত বিচরন করছে, আর মুক্তিবাহিনী সন্দেহে ছাত্র ও যুবক ছেলেদেরকে খতম করছে।

একদিন ট্রাকে করে হবিগঞ্জ সি,এস, ডি, গোডাউনে মাল পৌঁছে দিয়ে মকবুল ফিরে আসছিল। সুতাং পুলের উপরে হানাদার বাহিনীর কয়েকজন ট্রাক থামাল। তারপর মকবুলকে গাড়ী থেকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমহারা নাম কেয়া হ্যায়?

মকবুল উর্দূ না জানলেও প্রশ্নটা বুঝতে পেরে ইংরেজীতে বলল, মাই নেম ইজ মকবুল হোসেন।

ঃ তোমহারা কিতনা এলেম হ্যায়?
ঃ আই পাড দি এস, এস, সি এগজামিনেসন ইন ১৯৬৯।
হানাদারদের সন্দেহ দৃঢ় হল সে যখন ছাত্র তখন নিশ্চয় মুক্তিবাহিনী। তাদের মধ্যে একজন তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে বলল, ইয়ে জরুর মুক্তিবাহিনী কা আদমী, ইসকো গুলি মারো।
ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ট্রাকের ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে সেই হানাদারের হাত ধরে বলল, ওস্তাদ ইয়ে আপ কেয়া করতা হ্যায়, ইয়ে আদমী তো আপকা নোকরী করতা হ্যায়। আপলোগ খোদ গভর্মেন্ট হ্যায়। আপলোগ কা রেশন হর গোডাউনমে পৌঁছা দেনা ইনকা কাম হ্যায়।
ড্রাইভারের কথায় হানাদারটা বন্দুক নামিয়ে বলল, আচ্ছা ইয়ে বাত। ঠিক হ্যায় তোমলোগ যাও।
মকবুল সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে দীলে দীলে আল্লাহ পাকের শোকর গুজরী করে গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসল।
ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিয়ে বলল, সাহেব আপনি যুবক। ওরা যুবকদেরকে মুক্তি বাহিনী মনে করে নির্বিচারে গুলি করে মেরে ফেলছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আজ বেঁচে গেলে ও পরে কি হবে বলতে পারি না। আপনি এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যান।
মকবুলও সেই কথাই ভাবছিল। বলল, তাই করতে হবে। অফিসে ফিরে বড় সাহেবকে ঘটনাটা বলে কি করা উচিৎ পরামর্শ চাইল।
বড় সাহেব বললেন, আমার একটা রাইস মিল আছে। কয়েকদিন আগে ম্যানেজার বেশ কিছু টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে আপনাকে সেই পদে নিয়োগ করতে পারি। মকবুল যেন হাতে চাঁদ পেল। বলল, আমি রাজী আছি স্যার। আপনি যত শিঘ্রী পারেন এখান থেকে আমাকে রিলীজ করে ওখানে জয়েন করার ব্যবস্থা করে দিন।
দুদিন পর মকবুল শ্রীমঙ্গলেই "আফসার উদ্দিন গ্র্যান্ডিং রাইস-

মিলের" ম্যানেজার পদে জয়েন করল। তিন চার মাসের মধ্যে মকবুল মালিককে কয়েক হাজার টাকা লাভ দেখাল। মালিক খুশী হয়ে তার বেতন বাড়িয়ে দিলেন।

এদিকে নোয়াব আলি ও নূর বানু অনেকদিন ছেলের খোঁজ খবর না পেয়ে খুব উদ্বিগ্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তারা আল্লাহ পাকের কাছে তার জন্য দোওয়া করতে থাকেন। অনেকের কাছে খোঁজ খবর নেন। নূর বানু প্রত্যেক নামাযের পর কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করেন, "আল্লাহ গো, তুমি আমার বুকের ধনকে ফিরিয়ে এনে দাও, আমি দু জুম্মা রোজা রাখব।"

দেশ স্বাধীন হবার একমাস পর মকবুল দেশে ফিরে এল। তার বাবা মা তাকে পেয়ে ছোট শিশুর মত বুকে জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে আদর করে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর এতদিন কোথায় কিভাবে ছিল জিজ্ঞেস করলেন।

মকবুল সব কথা বলে এতদিন চাকরি করে যা কিছু টাকা পয়সা জমিয়েছিল, সব আব্বা আম্মার হাতে তুলে দিল।

তারা আর এক প্রস্থ দোওয়া করলেন।

পনের বিশ দিন পর মকবুল আব্বা আম্মাকে জানাল, সে পড়াশুনা করবে।

নোয়াব আলি বললেন, পড়াশুনা করবে ভাল কথা। কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে তাতে করে সংসার চালাতেই আমাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তোমার পড়ার খরচ যোগাব কি করে? দেশ স্বাধীন হল আর জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে।

মকবুল বলল, আপনাদের দোওয়া থাকলে আমি আমার পড়ার খরচ ইনশাআল্লাহ্ চালিয়ে নিতে পারব। আমি ঢাকায় গিয়ে প্রথমে একটা চাকরির চেষ্টা করব। তারপর আল্লাহ পাক রাজী থাকলে একটা কিছু করতে করতে পড়াশুনা ও চালিয়ে যাব।

নোয়াব আলি বললেন, তাহলে আমার আর কোন আপত্তি নেই। দোওয়া করছি, "আল্লাহ পাক তোমার মনের বাসনা পূরণ করুক।

একমাস বাড়ীতে থেকে মকবুল চাকরি ও পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে আব্বা আম্মার কাছ থেকে দোওয়া ও কিছু টাকা নিয়ে

ঢাকায় এল। হানাদারদের দীর্ঘ নয় মাসের অত্যাচারে ঢাকা শহর তখন আস্তাকুঁড়ে পরিণত হয়েছে। মকবুল সদরঘাটের একটা হোটেলে সিট ভাড়া নিল। তারপর নিজেদের গ্রামের একজন চাকুরীজিবী আলম সাহেবের কাছে। গিয়ে তার আশা আকাংখার কথা জানাল।

আলম সাহেব মকবুলকে গ্রামের একটা স্কলার ছাত্র হিসাবে জানতেন। সে জন্যে তাকে স্নেহ করতেন। পাড়া সুবাদে তিনি মকবুলের চাচা হন। বললেন, এক্ষুনী তো আর তোমাকে চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না। তবে আমি চেষ্টা করব যাতে তুমি তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে পার। তা এখানে উঠেছ কোথায়?

ঃ সদরঘাটের একটা হোটেলে।

ঃ হোটেলে ভাড়া দিয়ে আর কতদিন থাকতে পারবে। তার চেয়ে এক কাজ কর, কারো বাড়ীতে লজিং-এ থাকার চেষ্টা কর। আর মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করো। তোমার কাছে টাকা আছ? না থাকলে বল, আমি কিছু দিই।

ঃ না চাচা টাকা লাগবে না, বাড়ী থেকে কিছু এনেছি, আছে। আপনি আমার জন্য যে কোন একটা কাজের ব্যবস্থা করবেন।

ঃ তুমি আমার গ্রামের ছেলে। তোমার জন্য করব না তো কার জন্য করব। তুমি এখন গিয়ে যা বললাম সেই চেষ্টা কর।

মকবুল তাই করবো বলে উনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এল। ঢাকায় আসবার সময় পাশের গ্রামের জাফরের ঠিকানাও এনেছে। তার সঙ্গে স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুত্ব হয়। সে পার গেন্ডারিয়ায় লজিং-এ থেকে একটা সরকারী প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করছে। পরের দিন সকালে নাস্তা খেয়ে লোকজনের কাছে লোকেসান জিজ্ঞেস করল। তারপর খেয়া নৌকা করে বুড়ীগঙ্গা নদী পার হয়ে পারগেন্ডারিয়ায় জাফরের কাছে এল।

জাফর তাকে হঠাৎ দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সালাম ও কুশল বিনিময় করে বলল, কি খবর বল। তোর সঙ্গে অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। এতদিন কোথায় ছিলি?

মকবুল সব কিছু বলে তার কাছে আসার উদ্দেশ্য বলল।

জাফর বলল, চিন্তা করিস না, লজিং এর ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। তুই কাল একবার আসিস। একজন তার ছেলেমেয়েকে পড়াবার জন্য লজিং মাষ্টারের কথা কয়েকদিন আগে বলেছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলে রাখব।

মকবুল তাই আসব বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এল। পরের দিন সে জাফরের কাছে গেল।

জাফর তাকে সঙ্গে নিয়ে একজনদের সদরে গিয়ে একটা ছেলেকে দিয়ে বাড়ীর ভিতর খবর পাঠাল।

ছেলেটা ফিরে এসে বৈঠকখানার দরজা খুলে তাদেরকে বসতে বলে বলল, শাহিনের আব্বা বাড়ী নেই। আর আম্মা আপনাদেরকে বসতে বলল।

কিছুক্ষণ পর সামীনা বানু লিলি ও শাহিনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে দরজার বাইরে থেকে মকবুলকে দেখে ও তার সঙ্গে দুচারটে কথা বলে জাফরকে বললেন, ঠিক আছে উনাকে রাখা যাবে। সামীনা বানু জাফরকে চেনেন। জাফরকে কিছুদিন পাশের বাড়ীর ছেলেমেয়েদেরকে পড়াতে দেখেছেন।

সেই দিন বিকেলে মকবুলই হোটেল থেকে লজিং বাড়ীতে চলে এল। লজিং পাবার পর সে আব্বা আম্মাকে চিঠি দিয়ে জানাল, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আপনারা আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। শুধু দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক যেন আমাকে লেখাপড়া করার সুযোগ দেন।

দুই

লজিং মাষ্টারের চক বাজারে সাবানের কারখানা। তিনি সেখানেই থাকেন। মাসে দু একবার বাড়ীতে আসেন। বাড়ীটা চার কামরা। সবগুলোই টিনের দেওয়াল ও টিনের ছাউনি। দুটো শোবার ঘর, একটা রান্না ঘর আর একটা বৈঠকখানা। বৈঠকখানার ভিতর দিকের দেওয়ালে একটা জানালা আছে। মেহমান কুটুম বৈঠকখানায় থাকলে ঐ জানালাটা বন্ধ থাকে। মকবুলের বৈঠকখানায় থাকার ব্যবস্থা হতে ঐ জানালাটায় সামীনা বানু বন্ধ করে ভিতর দিকে একটা মোটা পর্দা লাগিয়েছেন। লজিং মাষ্টারের একটা বছর পনের বয়সের মেয়ে ও একটা বছর্ দশকের ছেলেকে পড়ানোর জন্য মকবুলকে লজিং দেওয়া হয়েছে। মেয়েটার নাম লিলি। সে ক্লাস এইটে পড়ে। আর ছেলেটার নাম্ শাহিন। সে ক্লাস ফোরে পড়ে। লিলি একটু এঁচোড়ে পাকা মেয়ে। ক্লাস এইটে দুবছরে ফেল করেছে। লজিং এ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলে ও অন্যান্য খরচের জন্য মকবুলের খুব অসুবিধে হতে লাগল। তার উপর লেখাপড়ার চিন্তা। প্রতিদিন ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে নাস্তা খেয়ে শহরে গিয়ে চাকরি ও টিউশনির চেষ্টা করতে লাগল। লজিং-এ ফিরতে বিকেল হয়ে যায়। প্রথম দিন দুপুরে চাকরানী ভাত নিয়ে ফিরে এলে সামীনা বানু জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার মাষ্টার ভাত খেলেন না কেন?

চাকরানী বলল, মাষ্টার সাহেব অহনো শহর থেইকা ফেরেন নাই।

সামীনা বানু বললেন, ঠিক আছে, চাপা দিয়ে রেখে দাও। মাষ্টার ফিরে এলে খেতে দিও।

কয়েকদিন একই ঘটনা দেখে সামীনা বানু একদিন মকবুলকে

বাড়ীর ভিতরে ডেকে পাঠালেন। আসার পর তার সামনে এস বললেন, আপনি প্রতিদিন কোথায় যান। খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম করলে শরীর টিকবে কেন?

মকবূল আজ দ্বিতীয়বার লজিং মিস্টেসকে দেখল। প্রথম দিন লজিং ঠিক করতে এসে তাকে দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিল। তখন মনে করেছিল, ইনি হয়তো ছাত্র-ছাত্রীর বড় বোন। এত অদ্ভুত সুন্দরী ও এত সুন্দর গড়নের মেয়ে এর আগে কখনো দেখেনি। মেয়েটাকে সে বারবার তাকিয়ে দেখেছে। তখন মকবুলের নব যৌবন মনে কেমন একরকমের তোলপাড় শুরু হয়। পরে যখন জানতে পারল ঐ মেয়েটা ছাত্র-ছাত্রীর মা তখন চুপসে গেছে। আজ এত কাছাকাছি এসে কথা বলছে দেখে একটু শিউরে উঠল। তারপর তার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, চাকরি ও কলেজে ভর্তি হবার জন্য চেষ্টা করছি।

সামীনা বানু বললেন, সে তো খুব ভাল কথা। তা বলে না খেয়ে থাকবেন কেন? এই কদিনে আপনার চেহারা অনেক মলিন হয়ে গেছে। কাল থেকে আমি তাড়াতাড়ি রান্না করে দেব। খেয়ে দেয়ে তারপর শহরে যাবেন। কথা শেষ করে তিনি মকবুলের ডান হাত ধরে একটা পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, এটা আপাততঃ রাখুন। লাগলে পরে আরো দেব। এই টাকায় কলেজে ভর্তি হয়ে যান। যখন যা লাগবে কোন দ্বিধা না করে বলবেন। তারপর তার হাত ছেড়ে দিলেন।

সামীনা বানুর কাজ ও কথা দেখে শুনে মকবুল চমকে উঠে অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার নরম তুলতুলে হাতের স্পর্শে মকবুলের সমস্ত শরীরের শীরায় শীরায় প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। মনের মধ্যে প্রথমদিন দেখে যে শীহরণ অনুভূত হয়েছিল, আজ তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী অনুভূত হতে লাগল। হঠাৎ তার বিবেক বলে উঠল, তোমার মত ধার্মিক ছেলে এরকম বেসামাল হওয়া উচিত না। সামীনা বানুকে ভাল মেয়ে বলে তার মনে হল না। কঠোরভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,

একি করছেন, টাকা দিচ্ছেন কেন? চাকরি পাবার পর আমি কলেজে ভর্তি হব। তারপর টাকাটা তার দিকে বাড়িয়ে বলল মাফ করবেন, এটা আপনি ফিরিয়ে নেন।

সামীনা বানু বললেন, কাউকে কিছু দিয়ে ফিরিয়ে নিতে নেই। যদি একান্ত ফেরৎ দিতে চান, তাহলে চাকরি পাবার পর দেবেন। চাকরি পেতে পেতে কলেজে ভর্তি হবার সময় পার হয়ে গেলে তখন আবার একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আমার ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন। আপনার সুবিধে অসুবিধের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কিনা আপনিই বলনু?

মকবুল বলল, আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু.....।

সামীনা বানু তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন, আপনার কোন কিন্তু আমি শুনবো না। টাকাটা না নিলে আমি খুব দুঃখ পাব। তাছাড়া টাকাটা ধার হিসাবে ও নিতে পারেন। সময় মত পরিশোধ করে দেবেন। এবার থেকে কোন কিছু দরকার হলে অথবা অসুবিধে হলে চাকরানীর মারফত জানাবেন।

মকবুল আর কোন কথা বলতে পারল না। টাকাটা নিয়ে ফিরে এল। পরের দিন জাফরের কাছ থেকে আরো কিছু টাকা ধার নিয়ে কবি নজরুল সরকারী কলেজে ভর্তি হল।

এরপর থেকে সামীনা বানু মকবুল কলেজে যাবার আগে রান্না করে ভাত পাঠিয়ে দেন।

আশেপাশের বাড়ীতে আরো চারজন মাষ্টার লজিং আছেন। তারা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অংক ঘন্টার পর ঘন্টা চেষ্টা করে ফল মেলায়। আবার কোন কোন অংকের ফল মেলাতে পারে না। মকবুল সব সাবজেক্টে ওস্তাদ। অংকে আরো ওস্তাদ। যত কঠিন অংক হোক না কেন, দুতিন মিনিটের মধ্যে ফল মিলিয়ে বলে, অংকটা খুব একটা কঠিন না। এই কথা ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ীতে বলা কওয়া করে। কিছুদিনের মধ্যে কথাটা সব বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ও তাদের গার্জেনদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর থেকে তার নাম হয়ে গেল অংকের ওস্তাদ। অন্যান্য বাড়ীর মাষ্টাররা কোন অংক না পারলে তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা মকবুলের কাছে এসে করে নেয়। এমন কি অনেক সময় মাষ্টাররা এসেও বুঝে নেয়। মকবুল শুধু অংকের ওস্তাদের জন্য নয়, তার চারিত্রীক গুণাবলীর কারণে সকলের কাছে শ্রেনীমত ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল। সে ঠিকমত নামায রোজা করে। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর মসজিদের কোরান শরীফ তেলাওয়াত করে।

এক শুক্রবারে মকবুল জুম্মার নামায পড়ে এসে খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোবার কথা চিন্তা করছিল। এমন সময় বাড়ীর চাকরানী এসে একটা চিঠি দিয়ে বলল, আম্মা দিছেন।

মকবুল অবাক হলে ও খুব একটা হল না। কারণ সেদিনের পর থেকে মনে মনে এই রকম কিছু আশা করছিল। চাকরানী চলে যাবার পর চিঠিটা খুলে চারটে পাঁচশো টাকার নতুন করকরে নোট দেখতে পেল। তখন তার মনে আগের দিনের মত তোলপাড় শুরু হল। টাকাগুলো হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল-

মাষ্টার সাহেব,

আমার চিঠি পেয়ে কি মনে করছেন জানি না। তবে আমি যে আপনার শুভাকাঙ্খী, এই কথা ভাবলে খুশী হব। প্রথম দিন আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগে। তারপর ক্রমশঃ আপনার সুনাম শুনে এবং আচার ব্যবহার দেখে আমি মুগ্ধ। আজ কেন এই পত্র দিলাম জানেন? আপানাকে সাবধান করার জন্য। এখানকার সেয়ানা সেয়ানা মেয়েদের মুখে আপনার গুণাবলী সমালোচনা হচ্ছে। তাদের গার্জেনদের অনেকে আপনাকে জামাই করার জন্য লালায়িত। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। কোন সেয়ানা ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না। তাদের কাউকে প্রশ্রয় দেবেন না। এমন কি লি-লিকে ও না। তাকে ও শাহিনকে ভালভাবে পড়াবেন। পড়াশুনার সময় ছাড়া লিলিকে মোটেই পাত্তা দেবেন না। আর

একটা কথা বলব মনে কিছু নেবেন না। আমি জানি কলেজে ভর্তি হতে প্রায় হাজার খানেক টাকা লাগে। ভর্তি হলেন কেমন করে? আমি ইচ্ছা করে কম টাকা দিয়ে কলেজে ভর্তি হতে বলেছিলাম। মনে করেছিলাম, বাকিটা আপনি আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন। নিলেন না কেন? খুব লজ্জা করে বুঝি? অন্যের কাছ থেকে ধার নিতে করে নি? লজ্জা আপনার থাকলেও আমার নেই। তাই দু হাজার দিলাম । যার কাছ থেকে ধার নিয়েছেন, তার টাকা শোধ করে দেবেন। আর বাকি টাকা বই খাতা কলম কিনবেন এবং নিজের হাত খরচ চালাবেন। আমি কেন আপনার জন্য এত কিছু করছি তা এখন বলতে পারছি না বলে দুঃখিত। আপনি হয়তো চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন। তবে একথা ঘুনাক্ষরেও চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে মেয়ে গতাবো বলে এরকম করছি। এরকম ভাবলে মনে ব্যথা পাব। আর টাকাটা যদি না নিয়ে ফেরৎ দিতে চান, তাহলে চারকরানীর হাতে দেবেন না। তার হাতে খবর দিয়ে নিজে বাড়ীর ভিতরে এসে দেবেন। বেশী কিছু লিখে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না।

ইতি–

আপনার শুভাকাঙ্খী সামীনা।

মকবুল চিঠি পড়া শেষ করে বুঝতে পারল, মেয়েটা নিশ্চয় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতি। কি কথা বলতে না পেরে দুঃখিত, তা মকবুল একটু বুঝতে পেরে শিহরীত হল। ভাবল, অন্যান্য সেয়ানা মেয়েদের চেয়ে তার কাছ থেকে আমাকে সাবধান থাকতে হবে। তারপর চিন্তা করল, টাকাটা ফেরৎ দেওয়া উচিৎ হবে কিনা। কারো পায়ের শব্দ পেয়ে চিঠিটা বালিশের তলায় রেখে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, মালা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে আছে। তাকে দেখে মকবুলের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ মনে শান্তির ধারা বইতে শুরু করল।

মালা পাশের বাড়ীর মেয়ে। ক্লাস টেনে পড়ে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। বেশ নম্র ও ধীর। শালীনতা বজায় রেখে

সব সময় কাপড় পরে। শালওয়ার কামিজ পরলেও বড় চাদর দিয়ে মাথা ও শরীরের উপরের অংশ ঢেকে রাখে। ঠোঁটে হাসির রেখা লেগেই থাকে। চোখ দুটো বেশ বড়। নাকটা ছোটও না বড়ও না। একহারা গড়ন হলে ও যৌবনে পা দিয়েছে বলে সারা শরীরে মাংস বেড়েছে। সামীনা বানু ও তার মেয়ে লিলি অপূর্ব সুন্দরী হলেও তার মনে মালার মত দাগ কাটতে পারেনি। মালাকে দেখলে মকবুলের মনে অনাবিল শান্তির ধারা বইতে শুরু করে। মাঝে মধ্যে এসে দু একটা অংক বুঝে নিয়ে যায়। মাস খানেক আগে প্রথম যেদিন লিলি তাকে সাথে করে নিয়ে এসে বলল, স্যার মালার একটা অংক করে দেবেন? ওদের স্যার অংকটা পারেনি। সেদিন মালাকে দেখে মকবুলের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তা আর অন্য কোন মেয়েকে দেখে হয়নি। তার মনে হয়েছিল, মালা যেন অন্য মেয়েদের থেকে স্বতন্ত্র। ঐদিন অংকটা বুঝিয়ে করে দিয়ে বলেছিল, আরো কোন অংক না পারলে এস, করে দেব। জী আসব বলে মালা চলে গেছে। তারপর আরো দুশুক্রবারে ঠিক এই সময়ে এসে অংক করে নিয়ে গেছে। আজও তার হাতে বই খাতা দেখে বলল, বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ভিতরে এস।

মালা ভিতরে আসার সময় সালাম দিয়ে বলল, আজ অংক করতে আসিনি। একটা কথা বলতে এসেছি। আজ প্রথম সে সালাম দিল।

তাকে সালাম দিতে শুনে মকবুল আনন্দিত হয়ে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, বেশ তো বল কি বলবে।

ঃ তার আগে বলুন, আমাকে দেখে বালিশের নিচে কি রাখলেন।

মকবুল একবার চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলল, চিঠি।

ঃ দেশ থেকে এসেছে বুঝি?

ঃ ওসব কথা বাদ দাও, যা বলবে বলে এসেছ বল।

ঃ আমি আপনার কাছে পড়তে চাই। আমাদের স্যার ভাল অংক করাতে পারে নি। আপনি রাজী হলে আব্বাকে বলব।

মালাকে মকবুলের খুব ভাল লাগে। তাকে নিয়ে প্রায় সে ভাবে। এই রকম মেয়েকে স্ত্রীরূপে পেলে জীবন সুখের হবে, শান্তির হবে। সেই মালা তার কাছে পড়তে চাই শুনে মকবুলের মনে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। বলল, আমি লিলিদের বাড়ীতে লজিং আছি। তোমাকে পড়াতে হলে তার বাবা মায়ের অনুমতি নিতে হবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে পরে তোমাকে জানাব।

ঠিক আছে স্যার তাই জানাবেন বলে মালা মন ভার করে চলে যেতে উদ্যত হল?

মকবুল তা বুঝতে পেরে বলল, মালা তুমি নিশ্চয় আমার কথায় রাগ করে চলে যাচ্ছ। আমি তো তোমাকে পড়াতে অরাজী নই। বাধাটা কোথায় তা তো বললাম। আমার দিকটা-একটু চিন্তা করা কি তোমার উচিত নয়।

মালা স্যারের কথায় তার মনোভাব ও নিজের ভুল বুঝতে পেরে হাসিমুখে বলল, আমার অন্যায় হয়েছে স্যার, মাফ করে দিন।

মকবুল বলল, অন্যায়টা যে তুমি বুঝতে পেরেছ, তাতেই আমি খুশী হয়েছি, এবার যাও।

মালা চলে যাবার পর মকবুল চিন্তা করল, মালাকে পড়াবার কথা শুনে লজিং মিস্টেস নিশ্চয় রাজী হবেন না। লিলিও হবে বলে মনে হয় না। কারণ মা ও মেয়ে দুজনেই যে তার প্রতি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে, কেউ সে কথা মুখে না বললেও মকবুল বেশ বুঝতে পেরেছে। লিলিকে অনেকবার লক্ষ্য করেছে, পড়াবার সময় সে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে থাকে। এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন তাকে কখনো দেখেনি। কয়েকবার ডেকে পড়ার কথা বলতে হয়। পড়তে এসে মাঝে মাঝে বালিশের তলায় চকলেট রেখে যায়।

মকবুল প্রথমে লজিং মিসট্রেসকে দেখে খুব মুগ্ধ হলেও তার পরিচয় জেনে নিজেকে কঠোভাবে গুটিয়ে রেখেছে। তিনি টাকা দিয়ে সাহায্য করলে এবং চিঠিতে তার মনোভাব বুঝতে

পেরে সময় সময় তার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করে। কিন্তু আল্লাহ পাকের ভয়ে এবং দুর্নামের ভয়ে মনকে শাসনে রেখেছে। লিলি সুন্দরী হলেও তার মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। যদিও যৌবনের ধর্ম অনুযায়ী যখন মাজে মাঝে তার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করে তখন আল্লাহও রাসুলের বানী স্মরণ করে এবং নিজের মান সম্মানের দিকে খেয়াল করে সামলে নেয়। কিন্তু এই মালা তাকে যেন যাদু করছো। তার কথা মনে পড়লে সে সব কিছু ভুলে যায়, সমস্ত দুঃশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়, মনে শান্তি অনুভব করে। তার চোখের দিকে চাইলে মকবুলের মনে হয়, সেও যেন তাকে পেতে চায়। মালার বাবা মাকে জানালে তারা যে আনন্দের সঙ্গে মেনে নেবেন, সে কথা মকবুল জানে। কিন্তু এই ছাত্র অবস্থায় কি করে তা সম্ভব। কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েশান নিয়ে একটা ভাল চাকরি বাকরি না করে মালাকে গ্রহণ করবো কি করে? ততদিন মালা অপেক্ষা করতে পারলেও তার বাবা মা কি করবেন? চিন্তাগুলো দূর করে দিয়ে মকবুল ঘুমোবার চেষ্টা করল।

কিছুদিন পরের ঘটনা। সরকারী ছুটির দিন। জোহরের নামায পড়ে মকবুল ঘুমিয়ে পড়েছে। টিনের দেওয়ালে টক টক শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখল, দরজা ভিড়ান রয়েছে। ঘরের মধ্যে কেউ নেই। মনের ভুল মনে করে আবার ঘুমোবার জন্য চোখ বন্ধ করল। এবার স্পষ্ট শুনতে পেল, মেয়েলি কণ্ঠে কেউ যেন বলছে, স্যার উঠে পড়ুন, আর ঘুমাবেন না, আসরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। মকবুল হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, সাড়ে চারটে। উঠে দরজা খুলে জগ নিয়ে চোখে মুখে পানি দেবার জন্য বাইরে এসে মালাকে দেখতে পেয়ে সালাম দিয়ে বলল, ভিতরে গিয়ে বস, আমি আসছি।

মালা সালামের উত্তর দিয়ে ভিতরে না গিয়ে বলল, আপনার ঘুমকে ধন্যবাদ। সেই কখন থেকে টিনে শব্দ করে ডাকছি, তবু যদি ঘুম ভাঙ্গাতে পারি।

মকবুল মুখ হাত ধুয়ে বলল, শুধু ঘুমকে ধন্যবাদ দিলে, যে ঘুমোচ্ছিল তাকে দেবে না? তারপর এস বলে ভিতরে এসে

তোয়ালে নিয়ে মুখ হাত মোছার সময় বলল, কি খবর বল।

মালা বলল, খবর তো আপনার কাছে। আমি কিন্তু আব্বাকে ঐ দিনই বলেছি। আব্বা বললেন, লিলিদের মাষ্টার যদি তোকে পড়ান, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

মকবুল কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় লিলি এসে মালাকে দেখে বলল, কিরে মালা, স্যারের কাছে কি জন্যে এসেছিস?

মালা মিথ্যে করে বলল, আমাদের স্যার আজ সকালে নাস্তা খেয়ে কোথায় গিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি। স্যারের কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম। তারপর মালা চলে গেল। লিলি ও তার পিছু নিল।

ঐদিন রাতে পড়াবার সময় মকবুল বুঝতে পারল, লিলি যেন কিছু বলতে চায়, শাহিন থাকায় বলতে পারছে না। পরের দিন সকালে পড়ার সময়ের একটু আগে লিলি এসে বলল, স্যার আমরা আর আপনার কাছে পড়ব না। কারণটাও এখন বলতে পারব না।

মকবুল কিছু বলার সুযোগ পেল না; চাকরানী নাস্তা নিয়ে এল। সেই সঙ্গে শাহিন ও পড়তে এল।

শাহিনের পড়া হয়ে যেতে সে বইখাতা নিয়ে চলে গেল। লি-লির কথা শুনে মকবুল এতক্ষণ চিন্তা করছিল, ওরা না পড়লে লজিং ছুটে যাবে। তখন মালাদের বাসায় লজিং থাকা যাবে। কিন্তু এরা আবার কিছু দুর্নাম টুর্নাম রটাবে না তো?

লিলি স্যারের মন খারাপ দেখে মনে মনে হাসছিল। শাহিন চলে যেতে একটা অংক স্যারকে দেখিয়ে বলল, এটা পারিনি করে দেন।

মকবুল বেজার মনে অংকটা করতে লাগল।

তাই দেখে লিলি মুখে ওড়না চাপা দিয়েও হাসি চেপে রাখতে পারছে না।

মকবুল বলল, কি হল এত হাসছ কেন?

লিলি বলল, আপনি কলেজে পড়ছেন অথচ আমার সামান্য রসিকতাটা বুঝতে পারলেন না?

মকবুল বেশ গম্ভীর স্বরে বলল, স্যারের সঙ্গে রসিকতা করা উচিৎ নয়।

ঃ ঠিক আছে স্যার আর করব না, মাফ করে দিন।

ঃ কথাটা মনে রাখার প্রতিজ্ঞা করলে মাফ করতে পারি।

ঃ তাই করলাম।

ঃ আমি ও করলাম।

ঃ এখন আসি স্যার?

ঃ এস।

এক বিকেলে মকবুল নদীর পাড়ে বসে নদীর দিকে তাকিয়ে নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিল। মেয়েলি কণ্ঠে স্যার ডাক শুনে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, মালার বড় চাচার মেয়ে লাবনী তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর ছোট বড় মিলিয়ে সাত আটজন মেয়ে কিছুটা দূরে বসে কথা বলছে। তাদের সঙ্গে মালাও রায়েছে। লাবনী মালার সঙ্গে ক্লাস টেনে পড়ে। তাকে দেখে মকবুল জিজ্ঞেস করল কিছু বলবে নাকি?

ঃ জী বলব, আপনি আমাকে পড়াবেন?

ঃ কেন? তোমাদের তো স্যার আছেন?

ঃ তিনি একদম অংক বোঝাতে পারেন না।

ঃ আমি পড়ালে তার লজিং চলে যাবে, মনে কষ্টও পাবেন। এটা করা কি আমার উচিৎ হবে?

ঃ কিন্তু উনি নিজেই অংকে কাঁচা, আমাদেরকে বোঝাবেন কি? উনার জন্য আমাদের পড়ার ক্ষতি হোক এটাও কি আপনি চান?

ঃ না তা চাই না। ঠিক আছে ভেবে দেখি।

ঃ ভাববার কি আছে, আমাদেরকে পড়ালে যদি লিলিরা আপনাকে লজিং এ না রাখে তা হলে আমাদের বাড়ীতে লজিং থাকবেন। আমি ও মালা আপনার কাছে পড়ব। আপনি মালাকে কঠিন কঠিন অংকগুলো কত সহজে বুঝিয়ে দেন। আপনাকে লজিং রাখতে মালার ও আমার আব্বা রাজী আছেন।

মকবুল বুঝতে পারল, মালার সঙ্গে যুক্তি করে লাবনী কথাটা বলতে এসেছে। বলল, সব কিছু ভেবে চিন্তে করতে হয়। এখন তুমি যাও, পরে তোমাদের জানাব।

লাবনী একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন বলে চলে গেল।

মকবুল চিন্তা করল, লিলিদের লজিং ছেড়ে দিয়ে মালাদের বাড়িতে লজিং থাকতে পারলে ভাল হত। মা ও মেয়েরে ছলা কলা থেকে বেঁচে যেতাম। সামীনা বানুর টাকার কথা মনে পড়ে চিন্তাটা থমকে গেল। তিনি পরে যে দুহাজার টাকা দিয়েছিলেন,তা ফেরৎ দেওয়া হয়নি। জাফরের টাকা পরিশোধ করার পর যা ছিল তা থেকে বইপত্র কিনতে ও হাত খরচে অনেক খরচ হয়ে গেছে। ঐ টাকাটা না দিয়ে এই লজিং ছেড়ে অন্য লজিংএ যাই কি করে? মালাদেরকে অন্য সময়ে পড়ানও সম্ভব নয়। সকালে ও রাত্রে লিলি ও শাহিনকে পড়াতে হয়। বাকি সময় কলেজে যাওয়া ও নিজের পড়া।

কয়েক দিন পরে মালা একদিন স্যারের কাছে অংক করতে এলে লিলি তা জানতে পেরে বৈঠকখানার বাইরে থেকে আড়ি পেতে রইল স্যারের সঙ্গে সে কি কি কথা বলে শোনার জন্য। এক সময় মালাকে হেসে হেসে কথা বলতে শুনে লিলি রুমের ভিতরে এসে বেশ রাগের সঙ্গে বলল, তোদের স্যার যদি অংক করতে না পারে তবে তাকে রেখেছিস কেন? অন্য স্যার রাখতে পারিস না? যখন তখন এসে স্যারের সময় নষ্ট করিস। স্যার নিজের পড়া পড়বেন কখন। আর আসবি না।

লিলির কথা শুনে মালা ও রেগে গেল। বলল, আমি কি রোজ রোজ আসি? স্যারের পড়ার ক্ষতি হলে উনি নিজেই নিষেধ করবেন। তুই বলার কে? তোর পেটে এত হিংসা কেন?

লিলি আরো রেগে গিয়ে বলল, স্যার আমাদের লজিং এ আছে। আমাদেরকে তার ভাল মন্দের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা বলব না তো কে বলবে? কই আমি কোন দিন তোদের স্যারের কাছে গেছি? তোকে আরো কয়েকদিন এখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। আমাদের স্যারের সঙ্গে আর কথাও বলবি না।

মালা বলল, তা হলে স্যারকে ঘরে নিয়ে রাখলেই পারিস।

মকবুল তাদেরকে ঝগড়া করতে দেখে খুব বিব্রত বোধ করছিল। ঝগড়া আরো বেড়ে যাচ্ছে দেখে দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমরা লেখাপড়া করছ। এরকম ঝগড়া করা তোমাদের উচিৎ হয়নি। তারপর মালাকে বলল, তুমি এখন যাও। মালা চলে যাবার পর লিলিকে বলল, ছি লিলি, শিক্ষকদের কাছে যে কোন ছাত্র-ছাত্রী সাহায্য নিতে আসতে পারে। আর শিক্ষকদেরও কর্তব্য, যে কোন ছাত্র-ছাত্রী সাহায্যের জন্য এলে তাকে সাহায্য করা। আমার পড়ার ক্ষতি হলে আমিই তাকে আসতে নিষেধ করে দিতাম।

লিলি স্যারকে মালার হয়ে কথা বলতে শুনে ভিতরে ভিতরে খুব রেগে গেল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে মাথা নিচু করে চলে গেল।

রাত্রে পড়ার পর লিলি বলল, মা বলেছে আপনি খুব ভাল স্যার। নচেৎ আমি আপনার কাছে পড়তাম না। যদি মালার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেন, তাহলে আমরা আপনাকে বিদায় করব না। মকবুল বলল, আমাকে তোমার কেমন মনে হয়? লিলি লজ্জিত কণ্ঠে বলল, আপনার মত আর কাউকে আমি দেখিনি। তারপর সে ছুটে পালিয়ে গেল।

সামীনা বানু লিলির ও মালার ঝগড়ার কথা জানতে পারেন। পরের দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ডেকে পাঠালেন। মকবুল আসার পর বসতে দিয়ে বললেন। আপনাকে নিয়ে আমি অনেক আশার জাল বুনেছি। আপনার মত ছেলেকে লজিং রেখে আমি গর্বিত। আপনাকে নিয়ে মেয়ে মহলে অনেক কথা হয়। অনেকে পড়তে চায়। আপনি কি তাদেরকে পড়াবেন?

মকবুল বলল, তা কি করে সম্ভব? আমার সময় কোথায়? তা ছাড়া এটা ভাল ও দেখায় না। তবে তাদের কিছু দরকার হলে তারা যদি বই খাতা পাঠিয়ে দেয়, তাহলে করে দেব। অথবা তারা মাঝে মধ্যে এসে বুঝে নিয়ে যেতে পারে।

সামীনা বানু বললেন, আপনার কথা শুনে খুশী হলাম।

মকবুল বলল, এবার তা হলে আসি?

সামীনা বানু বললেন, আসুন।

তিন

কয়েক মাস পরের ঘটনা। এক ছুটির দিন মকবুল দুপুরে খেয়ে দেয়ে নামায পড়ে ঘুমোচ্ছে। কিসের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রুমের চারদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না। ভাবল, ইঁদুর টিদুর হয়তো। চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করতে আবার শব্দ হল। কেউ যেন পায়ের দিকে টিনের দেওয়ালে টোকা দিচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল মালা নয় তো? মালাদের ঘরের দিকে বৈঠকখানার একটা জানালা আছে। জানালার পিছনে বেশ কয়েক ঝাড় কলা গাছ মালাদের ঘরগুলোকে আড়াল করে রেখেছে। তবু কেউ কিছু মনে করতে পারে ভেবে মকবুল কোন দিন জানালা খুলে নি। লিলির সঙ্গে ঝগড়া হবার পর মালা আর আসেনি। মাঝে মাঝে গোপনে ঐ জানালার কাছে এসে টোকা দিলে মকবুল জানালা খুলে কথা বলে। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মকবুল ভাবল, শব্দটা পায়ের দিকে হল বলে মনে হচ্ছে। ঐ দিকের রুমের তো লজিং মিস্টেস সামীনা বানু থাকেন। তাহলে কি উনিই শব্দ করছেন। শব্দটা আরো দুতিনবার হল। মকবুল উঠে সেদিকে তাকাতে দেখতে পেল, টিনের ফুটোতে কেউ যেন একটা চোখ রেখে তার দিকে চেয়ে আছে। মকবুল বুঝতে পারল সামীনা বানু। সে কি করবে না করবে ভেবে না পেয়ে মাথা নিচু করে বসে ভাবতে লাগল। আজ সকালে লিলি ও শাহিন তার মামার বাড়ী গেছে। মকবুল তা জানে। ঘুমোবার আগে চাকরানীকে মসজিদের দিকে চলে যেতেও দেখেছে। বাড়ীতে কেউ নেই। তাই সামীনা বানু তাকে কিছু বলতে চায়।

বললেন, মাথা নিচু করে কি এত ভাবছেন? এদিকে মুখ তুলে তাকান না, আপনাকে দেখে মনের আশ মেটাই। আপনাকে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু সবাইয়ের সামনে কি আর ভাল করে দেখা যায়? আপনাকে দেখার আগে আর কোনদিন আপনার মত এত সুন্দর ছেলে আমার নজরে পড়েনি। দিনের বেলা আপনাকে একা পাওয়া যায় না। রাত্রে ও অনেক অসুবিধে। আজ বাড়ীতে কেউ না থাকায় প্রাণ ভরে দেখবো বলে আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বিরক্ত করলাম। সে জন্যে মাফ চাইছি। তখনও মাষ্টারকে মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখে আবার বললেন, কই আমার দিকে একটু মুখ তুলে চান।

মকবুল মাথা তুলে সেদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, দেখুন আপনি খুব ভুল করছেন।

সামীনা বানু বললেন, ভুল মানুষ মাত্রেই করে। প্রথম জীবনে যে ভুল করেছি এখন তার সংশোধন করতে চাই। আপনাকে দুতিনটে চিঠি দিলাম, কিন্তু একটারও উত্তর পেলাম না। তারপর একটা চিঠি জানালা গলিয়ে মকবুলের খাটের উপর ফেলে দিয়ে বলল, এই চিঠিটার উত্তর দেওয়া চাই। কথা দিন দেবেন।

মকবুল সামীনা বানুর চিঠিগুলো পেয়ে কি উত্তর দিবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে দেয়নি। লজিং ঠিক হবার পর থেকে যে কয়েকবার সামীনা বানুকে দেখেছে, তাতেই বুঝেছে মেয়েটা অত্যন্ত সুন্দরী। তার যে দশ পনের বছরের দুটো ছেলেমেয়ে আছে, সে কথা বাস্তবে না দেখলে সবাইয়ের মত মকবুল ও বিশ্বাস করত না। যে কেউ তাকে দেখলে বলবে মেয়েটা অষ্টাদশী যুবতী। যেমন গায়ের রং তেমনি শরীরের বাঁধন। মেয়ে লিলি ও মায়ের থেকে কম না। মা মেয়ে এক সঙ্গে দাঁড়ালে কেউ বলবে না ওরা মা মেয়ে। বলবে দু বোন। লজিং ঠিক করতে এসে মকবুল তাদের দুজনকে পাশাপাশি দেখে তাই মনে করেছিল। আর সামীনা বানুর দিকে চেয়ে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তাই প্রথম দিন পড়াবার সময় আড় চোখে লিলিকে দেখেছে আর তার মায়ের কথা চিন্তা করেছে। তারপর এই এক

বছরে মা ও মেয়েকে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়তে দেখেছে। মকবুল সামীনা বানুর কথা শুনে এইসব চিন্তা করছিল।
তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সামীনা বানু বললেন, কি হল, কিছু বলছেন না কেন?
মকবুল বলল, কি বলব বলুন? আপনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী। সবকিছু জেনে শুনে যদি ভুল পথে অগ্রসর হন, তা হলে আমি কি করতে পারি? তবে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না, আপনি যা চাচ্ছেন তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ এর ফলে আপনার জীবনে যেমন নরক-যন্ত্রনা নেমে আসবে তেমনি আমার জীবনেও।
সামীনা বানু মাষ্টারের কথা শুনে যেমন মনে আঘাত পেলেন তেমনি রেগে গেলেন। তবু সংযত স্বরে বললেন, বিয়ের পর থেকে আমার জীবনে নরক-যন্ত্রণা নেমে এসেছে। আবার নামবে কি? সেই যন্ত্রণা এতদিনেও কমেনি, বরং হাজার গুণ বেড়েছে। আপনাকে দেখার পর থেকে সেই যন্ত্রণা কমতে আরম্ভ করে। আমার মন, আমার বিবেক আমাকে বলেছে, এই নরক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে কেবলমাত্র আপনিই পারবেন। তারপর ভিজে গলায় বললেন, মাষ্টার সাহেব আমার সেই আশা ভেঙ্গে দেবেন না। প্রথম দিন আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে যা দেখেছি, তাতে আমার দৃঢ় ধারনা হয়েছে আপনিও আমাকে নিয়ে ভাবেন। কই এদিকে তাকিয়ে বলুন, আমি সত্য বললাম কিনা।
মকবুল সেদিকে চেয়ে থেকে বলল, ক্ষেত্র বিশেষে অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না। আর উচিত ও না। কয়েকটা কথা বলছি শুনুন, মানুষ অনেক সময় ভুল করে কোন কাজ করে পরে পস্তায়। এই জন্যে মনীষীরা বলেছেন, "ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।" হাদিসেও আছে আল্লাহ পাকের রসুল (দঃ) বলেছেন, " কোন কাজ তাড়াহুড়ো করে করো না। তাড়াহুড়ো শয়তানের কাজ"। ভালভাবে ভেবে চিন্তে ধীরে সুস্থে সব কাজ করা উচিত। মানুষ যেমন ভুল করে তেমনি তাকে ভুলের মাশুলও দিতে হয়। যদি কেউ সেই ভুল

সংশোধন করার জন্য আর একটা ভুল করতে চায় এবং তা যদি কেউ জানতে পারে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির উচিত প্রথম ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া। আপনার কথা আমি স্বীকার করে নিয়ে বলছি, আপনাকে আর একটা ভুল করতে দেব না। কোরান পাকে আল্লাহ বলেছেন,-"শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" শয়তান মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে নানান অসৎ কাজ করার জন্য উৎসাহ জোগায়। যারা ধর্মের জ্ঞান রাখে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে কোন অন্যায় পথে অগ্রসর হয় না। দুনিয়াতে ভালর প্রতি সাবইয়েরই আকর্ষণ থাকে। তাই বলে তাকে পাওয়ার জন্যে অন্যায়ের পথ অবলম্বন করা কোন মানুষেরই উচিৎ না। যদি কেউ নিজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য বিবেক বিসর্জন দিয়ে সেই পথে অগ্রসর হয়, তাহলে মাত্র কয়েক দিনের জন্য সুখ শান্তি পেলেও চিরকাল এই মরজগতে যেমন অশান্তি পাবে তেমনি পরকালেও অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

সামীনা বানু মকবুলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ সব হিতপোদেশ আমাকে দিতে হবে না। ওসব আমার জানা আছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি অন্যায়ের পথে আমরা অগ্রসর না হয়ে ন্যায়ের পথে যাতে পাড়ি দিতে পারি, সে ব্যবস্থা আমি করবো।

মকবুল বলল, তা কি করে হয়? এট অসম্ভব কথা।

সামীনা বানু বললেন, মানুষ আজকাল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে। আপনি শুধু কথা দিন, আমাকে বিমুখ করবেন না। তারপর দেখবেন, আপনার জন্য আমি কি করি। প্রয়োজন বোধে আমি আমার নিজের প্রাণের বাজী রেখে আপনাকে একান্ত করে পাবার জন্য পথ তৈরী করবো।

মকবুল সামীনা বানুর সাহস দেখে ও তার কথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আর কোন কথা বলতে পারল না। তার ভীষণ ভয় করতে লাগল। যদি কেউ তাদের কথাবার্তা শুনে ফেলে। কথাটা মনে হতে শিউরে উঠল।

সামীনা বানু বললেন, কি হল শিউরে উঠলেন কেন? মনে হচ্ছে খুব ভয় পেয়েছেন। পুরুষের এটা শোভা পায় না। বিপদে যারা ভয় পায় তারা কাপুরুষ। আপনি তো তা নন। তবু কেন ভয় পাচ্ছেন?

মকবুল সামলে নিয়ে চিন্তা করল, আর বেশীক্ষণ এভাবে আলাপ করলে কেউ না কেউ জানতে পারবে। বলল, ভেবে চিন্তে কয়েকদিন পরে আপনাকে জানাব। এবার দয়া করে জানালাটা বন্ধ করে দিন। কেউ জানতে পারলে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না।

মৃদু হেসে সামীনা বানু বললেন, আপনি কলঙ্ককে ভয় করছেন কেন? পুরুষদের চরিত্রের যতই অবনতি হোক না কেন, তাদে গায়ে কোন কলঙ্কই দাগ কাটে না। কলঙ্ক তো মেয়েদের। তারা একটু কিছু অন্যায় করলেই তার সঙ্গে আরো কিছু জড়িয়ে কলঙ্কের ঢোল পিটান হয়। পুরুষ ও নারী দুজনে মিলে অন্যায় করে। অথচ পুরুষটাকে নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। অপরপক্ষে মেয়েটাকে নিয়ে নারী পুরুষ সবাই কলঙ্ক রটাতে থাকে। আমি কলঙ্ককে ভয় করি না। কারণ কলঙ্ক হল প্রেমের ভূষণ। সারা পৃথিবীর মধ্যে কোন প্রেমিক- প্রেমিকার কলঙ্ক রটেনি, এমন নজীর দেখাতে পারবেন? পারবেন না। আর একটা কথা বলে শেষ করব। লিলিকে একটু ও প্রশ্রয় দেবেন না। খুব কড়া নজরে দেখবেন। তারপর তিনি জানালা লাগিয়ে দিলেন।

মকবুল হতভম্বের মত কিছুক্ষণ জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে পড়তে শুরু করল। পড়া শেষ হতে অনেকক্ষণ পাথরের মূর্তির মত বসে রইল। তার বাহ্যিক জ্ঞান ও লোপ পেল। আসরের আযান শুনে চিঠিটা বালিশের তলায় রেখে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেল। উদ্ভ্রান্তের মত নামায পড়ে ফিরে এসে আর একবার চিঠিটা পড়তে লাগল-

মাষ্টার ভাই,

আমার অন্তারের অন্তস্থল থেকে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা পাঠালাম, গ্রহণ করে আমার নারী জন্মকে সার্থক করো। তুমি করে লিখছি বলে মনে কিছু নিও না। তুমি আজ একবছর ধরে আমার মনের মণিকোঠায় বাস করছ। জানি এক জনের স্ত্রী হয়ে এবং বড় বড় দুটো ছেলেমেয়ের মা হয়ে এভাবে গৃহশিক্ষকের কাছে পত্র দেওয়া ঘোরতর অন্যায়। তবু কেন লিখলাম, তা পুরো পত্রটা পড়লে বুঝতে পারবেন। আমি ধনী ঘরের মেয়ে। ইসলামপুর রোডে আমার বাবার পাঁচটা কাপড়ের পাইকারী দোকান। সেগুলোর মধ্যে বাবা একটা আমার নামে করে দিয়েছেন। বর্তমানে সেটার মালিক আমি না হলেও বাবা মারা যাবার পর হব। আমরা তিন ভাইবোন। দুভাইই আমার চেয়ে ছোট। যিনি আমার স্বামী, উনি আমার বড় ফুপুর ছেলে। ওনার নাম রসিদ। চার বছরের রসিদকে রেখে ফুপা মারা যান। আমার দাদা ফুপুর আবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ফুপু রাজী হয় নাই। ছেলেকে নিয়ে স্বামীর ভিটেয় থেকে যায়। অবশ্য ফুপু বেশীর ভাগ সময় তার বাবার বাড়ীতে থাকত। রসিদ সেইখানেই মানুষ হতে থাকে। ফুপু রসিদকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে মাঝে মাঝে গিয়ে স্বামীর ভিটে দেখাশুনা করত। দাদা মারা যাবার পর ফুপু ও রসিদ আমার বাবার কাছে থাকত। রসিদ ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর বাবা তাকে নিজের ব্যবসায় নামায়। তারপর থেকে ফুপু এখানে স্বামীর ভিটেয় থেকে যায়। রসিদ ও মায়ের কাছ থাকত। বাবার বিজনেস দেখাশুনা করত বলে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে ও তাকে থাকতে হত। তার সঙ্গে আমি মেলামেশা না করলে ও এমনি কথাবার্তা বলতাম। সে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। আমি এইচ.এস.সি. পাশ করে যখন ডিগ্রীতে ভর্তি হবার চিন্তা করছি তখন হঠাৎ একদিন শুনি রসিদের সঙ্গে আমার বিয়ে। শুনে বাবাকে ও মাকে বললাম, আমি আরো পড়াশুনা করব। এত তাড়াতাড়ি তোমরা আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছ কেন? বাবা বললেন, আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু তোর

বড় ফুপুর শরীর ভাল যাচ্ছে না। সে ছেলের বৌ দেখে মরতে চায়। তোকে তার খুব পছন্দ। আমি আর তোর মা তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে আমাদের হাতে ধরে কেঁদে কেঁদে তোকে বৌ করার কথা জানাল। তার অবস্থা দেখে আমরা না করতে পারিনি। জানিস বোধ হয়, তোর বড় ফুপুই আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। আমি যখন জন্মায় তখন তোর দাদী অনেকদিন কঠিন অসুখে ভুগেছিল। তাই তার মনে কষ্ট দিতে মন চাইল না। তুই চিন্তা করিস না, রসিদ খুব ভাল ছেলে। ব্যবসা খুব ভাল বুঝে। বিয়ের পর তাকে আলাদা ব্যবসা করে দেব। তাছাড়া মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। তুই সুখেই থাকবি। তবু আমি অমত প্রকাশ করে খুব কান্নাকাটি করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কান্নাকাটি কানে তুলেনি। একদিন খুব ধূমধামের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। স্বামীর ঘরে এসে প্রথম দিকে তেমন কোন অসুবিধে হয় নি। বড় ফুপু আগের থেকে আমাকে ভালবাসত। বৌ হিসাবে পেয়ে আরো বেশী ভালবেসেছিল। তবে স্বামীকে খুব আপন করে পেলাম না। সে একটু এড়িয়ে চলত। বিয়ের পর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে প্রগাঢ় টান, সেটা তার কাছ থেকে পেলাম না। বিয়ের পরপর বাবা তার চকবাজারের সাবানের কারখানা জামাইয়ের নামে লিখে দিয়ে সেটার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব রসিদের উপর ছেড়ে দিয়ে ইসলামপুরের দোকানগুলো দেখাশুনা করতে লাগল। রসিদ দিনরাত ব্যবসা নিয়ে ব্যাস্ত থাকত। প্রথম দিকে সাত আট দিন পর একদিনের জন্যে বাড়ী এসে সংসারের দরকারী জিনিস পত্র কিনে দিয়ে চলে যেত। আমার দেহের দিকে তার কোন টান ছিল না। প্রথম প্রথম লজ্জায় আমি কিছু বলতে পারতাম না। মনে করতাম এটা হয়তো তার স্বাভাব। বেশ কয়েক মাস এরকম চলার পর আমি অগ্র ভূমিকা নিলাম। সে সময় বুঝতে পারলাম তার যৌন ক্ষমতা খুব কম। চিন্তা করলাম এই জন্যে বোধ হয় আমার মত রূপসী বৌকে এড়িয়ে চলে। এখন আমাকে যে রকম দেখছেন, তখন যে কি রকম ছিলাম, তা

নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? যাই হোক একদিন লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে তাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বললাম। শুনে কিছু বলল না। এরপর থেকে মিলনের জন্য আমি অগ্রভূমিকা নিলে ও প্রায় এড়িয়ে যেত। আমার তখন শরীরের প্রচন্ড চাহিদা। আমি নিজেই জোর করে তাকে উত্তপ্ত করতে চাইতাম। কিন্তু সে বড় একটা সাড়া দিত না। শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে খাট থেকে নেমে যেত। যদি ও দুতিন মাস অন্তর এক আধবার মিলন হত, সে সময় আমাকে তৃপ্তি দিতে পারত না। বিয়ের দেড় বছর পর লিলি জন্মায়। তারপর থেকে সে আর আমার কাছে ঘুমোতো না। কথা বার্তাও বড় একটা বলত না। আমি কিছু বললে দায়সারা গোছের দু একটা কথা বলত। এর মধ্যে আমার ফুপু মারা গেল। ফুপু মারা যাবার পর সে বাড়ীতে আসা একদম বন্ধ করে দিল। অনেক দিন পর একাবার বাড়িতে এলে তার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বললাম, তুমি আমাকে এত অবহেলা কর, কেন? এই জীবন যৌবন তোমার জন্য। তুমি যদি আমাকে অবহেলা কর তাহলে আমি বাঁচব কেমন করে? তোমার স্বাস্থ্য এত সুন্দর। যদি কোন কারণে তোমার পুরুষত্ব নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন? বিয়ের আগে তোমাকে কত হাসি খুসি দেখেছি। বিয়ের পর থেকে তুমি সব সময় মন ভার করে থাক। আমাকে কোনদিন নিজের থেকে একটু আদর সোহাগ করনি। মেয়েরা স্বামীর আদর সোহাগ পাবার জন্য কত অধীর আগ্রহ নিয়ে থাকে। ফুপু বেচে থাকতে তবু আমি তোমার কাছ থেকে অল্প কিছু হলে ও নিজে আদায় করেছি। কিন্তু ফুপুর মৃত্যুর পর তুমি ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছ। এর কারণ আজ তোমাকে বলতেই হবে।

আমার স্বামী তখন আমাকে দুহাতে ধরে তুলে পাশে বসিয়ে ভারাক্রান্ত মনে বলল, কথাগুলো তোমাকে অনেক আগে বলা আমার উচিৎ ছিল। কিন্তু বলব বলব করে ও লজ্জায় বলতে পারি নি। আজ তুমি নিজেই যখন জানতে চাইছ তখন বলছি

শোন-প্রথমতঃ আমার বিয়ে করাই উচিৎ হয় নি। মায়ের মনে কষ্ট হবে বলে বিয়ে করে যে জঘন্য অন্যায় করেছি তা ভেবে নিজেকে খুব বড় অপরাধী মনে হয়। সেই অপরাধের জন্য আমি যে কত মর্ম্মাহত তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি সংকল্প করেছিলাম চির কুমার থাকব। কিন্তু মায়ের কঠিন অসুখের সময় তার কান্নাকাটিতে সে সংকল্প ত্যাগ করে বিয়ে করতে হয়। যৌবন প্রাপ্তির পর থেকে মেয়েদের প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ হয় নি। সেক্স সম্বন্ধে আমার যেমন কোন জ্ঞান ছিল না তেমনি তা জানার প্রয়োজন ও অনুভব করিনি। সোহেল নামে বড় লোকের এক ছেলে আমার বন্ধু ছিল। কলেজে পড়ার সময় সে আমাকে প্রায় সিনেমা দেখাত। সে ইংলিশ বই ছাড়া বাংলা বই দেখত না। একদিন আমাকে ব্লুফ্লিম দেখতে নিয়ে গেল। তা দেখে আমি খুব সামান্য উত্তেজিত হলাম। তার আগে কোন দিন আমি মেয়েদের দেখে অথবা তাদের কথা ভেবে উত্তেজিত হইনি। সেদিন ব্লুফ্লিম দেখার পর সোহেল আমাকে কিছু না জানিয়ে একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল । আমরা গিয়ে ডইংরুমে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দুটো সুন্দরী যুবতী শালীনতাহীন পোশাকে এসে সোহেলের দুপাশে বসে তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে লাগল। এক সময় সোহেল তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে তারা আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল। তাদের পোষাক ও কথা বার্তা দেখেশুনে সোহেলের উপর আমার যেমন রাগ হচ্ছিল তেমনি নার্ভাস ফিল করছিলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তাদের একজন বলল, আপনার বন্ধু দেখছি খুব লাজুক। এই লাইনে আজই প্রথম বুঝি? সোহেল বলল, হ্যাঁ, শুধু এই লাইনে প্রথম নয়, মেয়েদের ব্যাপারে ও একেবারে অনভিজ্ঞ। তাইতো ওকে তোমাদের কাছে নিয়ে এলাম। অপ্যায়নের পর সোহেল তাদের একজনের হাত ধরে পাশের রুমে যাবার সময় অন্য মেয়েটাকে বলল, তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানবান

করে দাও। ওরা চলে যাবার পর মেয়েটা আমার একটা হাত ধরে বলল, আসুন, দেখি কতটা আপনাকে জ্ঞানবান করতে পারি। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অপত্তি করে যেতে চাইলাম না। কিন্তু মেয়েটা ছাড়ল না। আমাকে জড়িয়ে ধরে জোর করে একটা রুমে নিয়ে গিয়ে যা করার সেই অগ্রভূমিকা নিয়ে করল। জীবনের এই প্রথম নারীর সংস্পর্শে এসে খুব ভয় পেয়ে যায়। কাজ শেষে মেয়েটা বলল, আপনার পুরুষত্ব খুব কম। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করান। নচেৎ বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে পারবেন না। তারপর আমি অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। তাতে কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু সেই মেয়েটার কথা সব সময় মনে পড়ত। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বিয়ে করব না। কিন্তু মাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি। তখন ভেবেছিলাম, আমি তোমাকে যৌনসুখ দিতে না পারলেও আত্মিয়তার খাতিরে তুমি সব কিছু সহ্য করে নিবে। তাই তুমি করে ও চলেছ। কিন্তু একজন পূর্ণ যুবতীর দেহের চাহিদা যে কি, এখন তা জেনে এবং আমার পুরুষত্ব হীনতার কারণে আজীবন তুমি যে আশান্তি ভোগ করে চলেছ, তা জেনে আমি অন্তর দন্দে জ্বলে ছারখার হয়ে যাচ্ছি। বাড়ীতে এসে তোমাকে দেখলে সেই জ্বালা আরো শতগুণ বেড়ে যায়। শুধু মনে হয়, এতবড় অন্যায় কেন করলাম। তোমার অবস্থা দেখে আমার খুব দুঃখ হয়। সে জন্যে কত বড় বড় ডাক্তারের সরনাপন্ন হয়েছি, কিন্তু সামান্য উপকার হলে ও তোমাকে সন্তুষ্ট করার মত শক্তি ফিরে পাইনি।

স্বামীর কথা শুনে চমকে উঠে ভাবলাম, জীবনে কোন দিন আমি যৌন সুখ পাব না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে নিজে স্বামীকে নিয়ে অনেক ডাক্তারের চিকিৎসা করিয়েছি। তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। লিলির জন্মের পাঁচ বছর পর শাহিন হয়। কিন্তু কোন সময়েই যৌন মিলনে সে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। শাহিনের জন্মের পর থেকে তার যৌন ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়ে যায়। ভাগ্যে নেই সেই কথা ভেবে

মনকে এতদিন প্রবোধ দিয়ে রেখেছিলাম। কেন কি জানি তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন সেই তৃপ্তি পাবার জন্যে বল্গাহারা উন্মাদ হরিণীর মত ছুটে চলেছে। শয়নে, সপনে, জাগরণে চব্বিশ ঘন্টা তুমি আমার অন্তর জুড়ে রয়েছে। আমার মন কেবলই বলে, এই মকবুলই তোমার বুভুক্ষ্য কামনাকে তৃপ্তি দিতে পারবে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। তারা কি ভাববে, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে এবং সমাজে যে কত বড় কলঙ্ক রটবে, সে সব কথা যে ভাবিনি তা নয়, সব কিছু ভেবেছি। কিন্ত সব ভাবনাকে ছাপিয়ে নারী জনমের চরম তৃপ্তি ও শান্তি পাবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। আমাকে খুব নির্লজ্জা ও বেহায়া মেয়ে মনে হচ্ছে তাই না? হয়তো তাই। তা না হলে এই বয়সে ছেলেমেয়ের গৃহশিক্ষকের কাছে কোন মেয়ে এরকম করে লিখতে পারে না। এজন্যে আমার নারী দেহের আজন্ম তৃপ্তি পাবার কামনা দায়ী। প্রাগলের মত অনেক কিছু লিখলাম, আর দু চারটে কথা লিখে ইতি টানবো। আপনাকে ন্যায়ের পথে, ধর্মের পথে জীবন সঙ্গি করতে চাই। আমি স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে বাবা মার কাছে চলে যাব। তারপর তোমার আমার বিয়ে হবে। বাবা মা ও ভাইয়েরা আমার সব কিছু জানে। আমার জন্যে তারা ও খুব অশান্তিতে আছে। সেদিক থেকে কোন বাধা আসবে না। আমার স্বামী আমাকে প্রায় বলে, তুমি অত্যন্ত রূপবতী ও গুণবতী মেয়ে। তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য্য ভাগ্যের ফেরে আমি নষ্ট করে দিচ্ছি। তুমি যদি আমার কাছ থেকে তালাক নিয়ে অন্যত্র বিয়ে বস, তাহলে মনে শান্তি পেতাম। তোমার এতরূপ ও সৌন্দর্য্য বিফলে যাচ্ছে দেখে অমার খুব দুঃখ হয়। তখন ছেলেমেয়েরা কষ্ট পাবে মনে করে তার কথা মেনে নিতে পারি নাই। এখন তারা বড় হয়েছে। তাছাড়া বাব মা ও ভাইয়েরা যাতে করে তাদেরকে দেখাশুনা করে, সে ব্যবস্থা করব। আর তোমার ভব্যিষৎ জীবন যাতে উজ্জ্বল হয় তার সমস্ত দায় দায়িত্ব আমি নেব। আমার প্রিয়তম স্বামীকে দেশের এমন রত্ন করে তোলার

চেষ্টা করবো যেন কেউ না বলতে পারে মকবুল দুটো ছেলেমেয়ের মাকে বিয়ে করে উচ্ছন্নে গেছে। আমার বাবা মার দেওয়া পনের ভরী সোনার গহনা এবং স্বামীর ও শাশুড়ীর দেওয়া দশ ভরী সোনার গহনা আছে। স্বামী দেহের সুখ দিতে না পারলেও আমাকে খুশী রাখার জন্য সোনাদানা, কাপড়-চোপড় ও প্রসাধন কেনার জন্য প্রচুর টাকা পয়সা দেয়। ঐ টাকা সামান্য কিছু খরচ করে বাকিটা ব্যাংকে আমার সেভিং একাউন্টে জমা রেখেছি। পাস বইয়ের হিসাবে তা লাখের উপরে। তাছাড়া ইসলামপুরের দোকনের যা আয় তা সবটা আমার কারেন্ট একাউন্টে জমা হচ্ছে। সব কিছু বিয়ের পর তোমার হাতে তুলে দেব। শুধু দেন মোহরের এক লাখ টাকা স্বামীকে মাফ করে দেব। আমার সমস্ত কিছু উজাড় করে তোমাকে বড় করার চেষ্টা করব। এতদিনে তোমাকে যতটা জেনেছি, তাতে করে আমার দৃঢ় ধারণা, নিশ্চয় একদিন না একদিন তোমার নাম দেশের লোকজন শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবে। যা কিছু করার আমি বাব মা ও ভাইয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে করব। তারা যে আমার সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থেক। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি শুধু এই হতভাগীকে গ্রহণ করার অঙ্গীকর দিয়ে দেখ, আমি কি করি। শেষে একটা অনুরোধ করব, লিলি ও শাহিনকে চাচার নজরে দেখবে। আর কিছু লিখে তোমাকে বিরক্ত করব না। তোমার উত্তরের আশায় রইলাম।

ইতি-

দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়ে মকবুল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইল। মাগরিবের আযান শুনতে পেয়ে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেল।

রাতে মকবুল মোটেই ভাত খেতে পারল না। অল্প কিছু খেয়ে উঠে পড়ল। চাকরানী বলল, কি হল স্যার, কিছু যে খাইলেন না। সব পইরা রইছে।

মকবুল বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না, এগুলো নিয়ে যাও।

পরেরদিন মকবুল কলেজে গিয়ে শুনল, ফার্ষ্ট ইয়ারের পরীক্ষার

রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে সেকেন্ড হয়েছে। ক্লাসে গিয়ে পৌঁছাতে অনেক ছেলে তাকে ঘিরে বলল, মিষ্টি খাওয়াতে হবে। রেজল্টে

জেনে মকবুলের ভারক্রান্ত মন আনন্দে ভরে গেছে। বলল, তোদের সবাইকে মিষ্টি খাওয়াতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা আমার কাছে নেই।

তাদের মধ্যে একটা ছেলে বলল, তোর কাছে যা আছে দে, বাকিটা আমি ধার দেব তুই দিয়ে দিস।

মকবুল আর কি করবে, তার কাছে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ছিল। সেটা তার হাতে দিয়ে বলল, এটা দিয়ে ম্যানেজ কর, তোর টাকা শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। তারপর সে কেটে পড়ল। কলেজ থেকে বেরিয়ে মতিঝিলে আলম সাহেবের অফিসে গেল। সালাম বিনিময় করে তাকে চাকরির কথা জিজ্ঞেস করল।

আলম সাহেব বললেন, একজায়গায় একটা ব্যবস্থা করেছি। কিছু দিনের মধ্যে হয়ে যাবে বলে মনে হয়। মাস খানেক পরে দেখা করো।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার পথে মকবুল চিন্তা করল, ব্যাপারটা জাফরকে বলবে কিনা। শেষে ভাবল, এসব ব্যাপার কাউকে বলা ঠিক হবে না। কয়েকদিন ধরে এই ব্যাপারে অনেক চিন্তা ভাবনা করে কিছু ঠিক করতে পারল না। তার এক মন বলে, সামীনার মত মেয়ে পেলে তুমি ধন্য হয়ে যাবে। সে তোমাকে মাথার মণি করে রাখবে। তোমার উন্নতির পথ খুলে যাবে। সারা জীবন সুখ শান্তিতে কাটাতে পারবে। এ রকম সুযোগ সবার ভাগ্যে জুটে না। এ সুযোগ হারান তোমার উচিৎ না। আবার আর এক মন বলে, এত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করলে বাবা মা, আত্মীয় স্বজন ও দেশের লোক ছি ছি করবে। তা ছাড়া ছাত্র অবস্থায় সামীনার গহনা ওটাকার উপর ভরসা করে বিয়ে করা কি ঠিক হবে? তার ছেলে মেয়ে লিলি ও শাহিন কি মনে করবে। লিলি ও তাকে ভালবাসে। তাদের কাছে মুখ দেখাব কি করে? এই সব চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন

গড়িয়ে যেতে লাগল।

কয়েক দিন পর লিলি মকবুলের হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে বলল, এটা পড়ে উত্তর দিবেন।

মকবুল জিজ্ঞেস করল, এটা কে দিয়েছে?

পড়লেই বুঝতে পারবেন বলে লিলি ছুটে পালিয়ে গেল।

মকবুল কাগজটা খুলে পড়তে লাগল

স্যার,

প্রথমে আমার সালাম নিবেন। পরে জানাই যে, আপনার মত সুন্দর ছেলে আমি দেখি নি। আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। সব সময় আপনার কাছে থাকতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় আপনাকে না পেলে বাঁচবো না। আমি আপনাকে অনেক ভালবাসি। তাই পড়ার সময় ছাড়া অন্য সময় আপনাকে দেখতে যাই। কিন্তু আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে যেন বাঁচেন, সেই রকম ব্যবহার করেন। তখন আমার খুব কান্না পায়। একটু ভাল ব্যবহার করতে পারেন না? আমার মুখের দিকে চেয়ে ভাল করে কথাও বলেন না অথচ মালার দিকে হাসি মুখে চেয়ে কথা বলেন। আশা করি এই চিঠি পড়ে আর ঐ রকম করবেন না। আমাকে আপনি কতটা ভালবাসেন জানাবেন।

ইতি

আপনার প্রিয় ছাত্রী লিলি

লিলি এ বছর ভাল রেজাল্ট করে নাইনে উঠেছে। আগের চেয়ে যেমন একটু সেয়ানা হয়েছে তেমনি একটু ফরওয়ার্ড ও হয়েছে। তাই সাহস করে স্যারকে পত্র দিয়েছে।

লিলি অনেক দিন থেকে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে সে কথা বুঝতে পেরে এবং তার মায়ের বার বার সাবধান বাণী শুনে মকবুল তাকে মোটেই পাত্তা দেয় নি। রুমে থাকলেই একটা না একটা অজুহাতে আসবে। মকবুল তখন নিজের পড়ার ক্ষতি হবার কথা বলে বিদায় করে দেয়। কিছুদিন আগে লিলির মায়ের চিঠি পড়ে এমনিই মকবুল দিশেহারা। তারপর লিলির চিঠি পেয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হল। মাথায়

তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে নদীর পাড়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় বসে কি করা উচিৎ ভাবতে লাগল। চিন্তায় চিন্তায় এই কদিন মোটেই পড়াশুনা করতে পারছে না। লিলি শাহিনকে নিয়মিত পড়ালে ও ভালভাবে পড়াতে পারছে না।

চিঠি দেওয়ার পর থেকে লিলি স্যারের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আগের মত বেশী কথা বলতে সাহস করে না। তার ভয় হয়েছে, স্যার যদি মাকে চিঠির কথা বলে দেয়, তাহলে মা তাকে আস্ত রাখবে না। এমনি কতবার স্যারের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে।

মাস দুয়েক পর একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় সদর ঘাটে মালার সঙ্গে মকবুলের দেখা। লিলির সঙ্গে ঝগড়া হবার পর থেকে সে আর মকবুলের কাছে প্রকাশ্যে যাই নি। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে গোপনে কথা বলে। মালার এস, এস, সি, পরীক্ষা হয়ে গেছে। আজ কিছু কেনাকাটা করার জন্য সদর ঘাটে এসেছিল। কেনাকাটা শেষ করে খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করছিল। মকবুল তার কাছে এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি মালা কেমন আছ? কোথায় গিয়েছিলে?

মালা মকবুলকে আসতে দেখেছে। সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমার কথা বাদ দিন। আপনাকে এরকম উস্কখুস্ক দেখাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে কতদিন শরীরের দিকে খেয়াল করেন নি। বেশ কিছু দিন থেকে আপনাকে লক্ষ্য করছি, আপনি খুব গম্ভীর হয়ে থাকেন।

মকবুল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার মানষিক অবস্থা ভাল নয়, খুব দুঃশ্চিন্তায় ভুগছি।

মালা বলল, কি এমন ব্যাপার ঘটল, যার ফলে আপনার এরকম অবস্থা। চলুন না কোথাও বসে কিছুক্ষণ আলাপ করি।

মকবুল এস বলে তাকে সঙ্গে করে টার্মিনালে এসে দুটো টিকিট কেটে দোতলায় দর্শকদের বসার রুমে দুজন দুটো চেয়ারে বসল।

মালা বলল, এবার বলুন আপনার কি হয়েছে।

মকবুল বলল, সব কথা সরাইকে বলা যায় না। আমি একটা

সমস্যায় পড়েছি, যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।
ঃ সমস্যাটা বলুন, চেষ্টা করব সমাধানের পরামর্শ দেবার।
ঃ এটা খুব জটীল সমস্যা, বলতে পারছি না বলে দুঃখিত।
মালা ছলছল নয়নে বলল, আমাকে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু মনে রাখবেন আমি আপনাকে প্রথম দেখার পর থেকে যেমন ভালবাসি তেমনি বিশ্বাস করি। তাই তো লিলির সঙ্গে ঝগড়া হবার পর আপনার কাছে না গেলে ও দূর থেকে দেখে মনের আশা মেটাই। যখন একদম মনকে মানাতে পারিনা তখন আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে জানালা দিয়ে কথা বলি।
তার চোখে পানি দেখে মকবুল বলল, আমার কথায় তুমি মনে কষ্ট নিও না। তোমার মনের খবর আমি জানি মালা। আমিও তোমাকে ভালবাসি। এখন ছাত্র বলে তোমাকে সেকথা জানাইনি। তোমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন, অনেক সাধ। জানি না আল্লাহ পাকের কি মর্জি। লেখাপড়া শেষ করে কিছু একটা করার পর তোমাকে পেতে চাই। ততদিন কি তুমি অপেক্ষা করবে? না তোমার গাজেনরা করবে? সেই জন্যে নিজেকে তোমার কাছে প্রকাশ করি না। ভাগ্যচক্রে আজ আমরা দুজনের মনের খবর জানতে পারলাম। মানুষ ভাগ্যের হাতে বন্দি। আমার ভাগ্য বড় খারাপ। তা না হলে এতদিনে ডিগ্রীর শেষবর্ষে পড়তাম। এখন এখানে ও ভাগ্য আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমি বোধ হয় লিলিদের লজিংএ বেশী দিন আর থাকতে পারবো না।
এই কথা শুনে মালার তখন কিছুদিন আগের লিলির কথা মনে পড়ল। সেদিন লিলি তাকে বলেছিল, ঐদিন তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম বলে তুই খুব রাগ করেছিস না? কেন করেছিলাম জানিস, স্যারকে আমি ভালবাসি। তাকে ছাড়া বাঁচব না। তাই তোকে স্যারের কাছে অংক করতে আসতে দেখে আমার খুব রাগ হত। মনে করতাম তুইও বুঝি স্যারকে ভালবাসিস। সেদিন তুই যখন হেসে হেসে কথা বলছিলি তখন রাগ সামলাতে পরিনি।

এখন স্যারের কথা শুনে মালা মনে করল, লিলি নিশ্চয় স্যারের কাছে প্রেম নিবেদন করেছে। স্যার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বলে হয়তো এই কথা বলছে। জিজ্ঞেস করল, আপনার মত ছেলেকে সবাই লজিং রাখার জন্য হাঁ করে রয়েছে। আর আমিও তো আপনাকে আমাদের বাড়ীতে থাকার কথা বলেছিলাম।

মকবুল বলল, তা হয় না মালা। তোমাদের বাড়ীতে থাকলে ওরা তোমার ও আমার নামে দুর্নাম রটাতে পারে। তাছাড়া এটা শোভা পায় না।

ঃ তা হলে কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?

ঃ না এখনো কিছু করিনি। তবে কিছু দিনের মধ্যে হয়তো ছোট খাট একটা চাকরি পেয়ে যেতে পারি। যদি আল্লাহ মুখ তুলে চায়, তা হলে চাকরিটা পাবার পর শহরে চলে যাব।

ঃ শহরে গেলে আমার কথা মনে রাখবেন বলে মালা চোখ মুছল।

ঃ মনের জিনিস মনে সব সময় থাকে। তাকে রাখার দরকার হয় না। আমি ভাবছি অন্য কথা।

ঃ বলুন কি ভাবছেন।

ঃ ভাবছি আমি যখন উপযুক্ত হয়ে তোমাকে নিতে আসব তখন তোমাকে পাব কিনা।

ঃ আপনার জন্য আমি সারা জীবন অপেক্ষা করব।

ঃ তা আমি জানি। সমস্যা হচ্ছে তোমার গার্জেনদের নিয়ে। তারা কি অতদিন অপেক্ষা করবে?

ঃ যেমন করে হোক তাদেরকে আমি ঠেকাবো। তুমি শুধু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখ।

ঃ তাতো রাখবই। এবার চল ফেরা যাক।

নিচে এসে টার্মিনালের হোটেলে দুজনে চা নাস্তা খেল। তারপর মালাকে খেয়া নৌকায় তুলে দিয়ে বলল, তুমি যাও, আমি পরে আসছি।

চার

এদিকে লিলি ও সামীনা বানু মকবুলকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগল। সামীনা বানু মেয়ে দিন দিন ম্যাস্টারের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে বুঝতে পেরে খুব কড়া শাসনে রেখেছেন। মেয়ে তার প্রিয়তমর জন্য সব শাসন নীরবে সহ্য করে নিচ্ছে। মকবুল সব কিছু বুঝতে পেরে ও না বোঝার ভান করে থাকে। মা ও মেয়েকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্ট করে। আর চাকরির জন্যে বার বার আলম সাহেবের কাছে ধর্না দেয়। লজিং ছুটে যাওয়ার ভয়ে মালার সঙ্গ যোগাযোগ করে না। একদিন পড়ার সময়ের একটু আগে এসে লিলি মকবুলকে জিজ্ঞেস করল, স্যার সেদিনের পত্রের উত্তর দিলেন না যে?

মকবুল বলল, ঐ সব ব্যাপারে ধীরে সুস্থে দিতে হয়, তুমি এখন পড়তে বস।

লিলি সাহস করে আর কিছু বলতে পারল না।

মকবুলের ইচ্ছা যদি চাকরি না হয় তা হলে কোন রকমে ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত এখানে থেকে পরীক্ষাটা দেওয়া। আলম সাহেবের চেষ্টায় ১৯৭২ সালের আগাষ্ট মাসের এক তারিখে বি,টি, এম, সিতে মকবলের চাকরি হল। চাকরির কথা সে গোপন রেখে সমীনা বানুর ধার পরিশোধ করার জন্য টাকা জমাতে লাগল। মাস ছয়েকের মধ্যে ঐ পরিমাণ টাকা জমা হতে একদিন একটা চিঠি লিখে টাকাসহ খামে করে চাকরাণীর হাতে সামীনা বানুর কাছে পাঠাল। চিঠিতে লিখল, টাকাটা পাঠালাম গ্রহণ করে ধন্য করবেন। টাকা দিয়ে আমার যা উপকার করেছিলেন, সে ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না। আপনার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। ছোট

খাট একটা চাকরি পেয়েছি। ভাবছি শহরে চলে যাব। এতদিন আপনাদেরকে অনেক কষ্ট দিলাম। সে জন্যে ক্ষমা চাইছি। লিলি ও শাহিনের জন্য একজন মাষ্টার রাখার ব্যবস্থা করবেন। জেনে অজেনে হয়তো আপনাদের মনে অনেক দুঃখ দিয়েছি। সেজন্যে আর একবার ক্ষমা চেয়ে শেষ করছি।

ইতি

মকবুল

সামীনা বানু ঐভাবে মাষ্টারকে মনের কামনা বাসনা জানিয়ে চিঠি দিয়ে উত্তরের আশায় দিনের পর দিন অধীর আগ্রহ নিয়ে কাটাতে থাকেন। বেশ কিছুদিন আতিবাহিত হবার পরও যখন কোন উত্তর পেলেন না তখন ভাবলেন, মাস্টার তাকে খারাপ মেয়ে ভেবে সাড়া দিল না, না সে অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসে? হঠাৎ তার মনে হল, সে কি লিলিকে ভালবাসে? লিলি যে তাকে ভালবাসে , তা তার কথা বার্তাতে বেশ বোঝা যায়। তাই তাকে শাসনও করে। যদি সত্য সত্যই মাস্টার ও লিলিকে ভালবাসে তা হলে আমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব। লিলি যাতে মাস্টারের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে না পারে সেদিকে খুব রক্ষ্য রাখলেন। আর মাস্টারের মন জয় করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

আজ দীর্ঘ ছয় সাত মাস পরে মাষ্টারের চিঠি পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। তারপর দোদুল্য মনে খাম থেকে চিঠি বের করে টাকা দেখে মনে হোঁচট খেলেন। টাকাটা হাতে নিয়ে চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষন কাঁদলেন। শেষে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে সামলে নিয়ে মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে মাস্টারকে চিঠি লিখলেন

মাস্টার সাহেব,

সেদিন মনের এক দুর্বল মূহুর্তে আমার দুঃখের কথা এবং সেই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ঐ রকম ভাবে চিঠি দিয়েছিলাম। এই হতভাগী জীবনে কোনদিন শান্তি পাব না। ভাগ্যে না থাকলে কি করে পাব? এক ভাগ্যবিড়ম্বীতা নারীর ডাকে সাড়া না দিয়ে খুব ভাল করেছেন। সেদিনের সেই

চিঠির জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাইছি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আমি আমার সমস্ত তনু মনু দিয়ে আপনাকে ভালবাসি। সেই জন্যে আপনাকে না পেলে ও আজীবন ধ্যান করব। যাই হোক চাকরি পেয়েছেন জেনে খুশী হয়েছি। চাকরি পেয়েছেন, ঋণ পরিশোধ করলেন, ভাল কথা। কিন্তু এখান থেকে চলে যাবেন কেন? মনে হচ্ছে আমার কারণে চলে যাচ্ছেন। আপনাকে ধরে রাখার অধিকার আমার নেই। তবু থাকার জন্য অনুরোধ করছি। আমার কারণে চলে গেলে আমার দুঃখ আরো বেড়ে যাবে। নিজেকে অপরাধী ভেবে মনে খুব কষ্ট পাব। আর যদি এখানে থাকলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে ভেবে চলে যেতে চান, তাহলে লিলি ওশাহিনকে শুধু রাত্রে একঘন্টা পড়াবেন। তুব চলে যাবেন না। আপনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন, আপনার ভবিষ্যৎ সুখের হোক, শন্তির হোক এই কামনা করে শেষ করছি।

ইতি

অভাগিনী সামীনা

মকবুল চিঠি পড়ে বুঝতে পারল, তার ডাকে সাড়া দিইনি বলে মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন। ভাবল, এখন যদি আবার চলে যাই, তাহলে আরো বেশী মনে কষ্ট পাবেন। কিছু দিন থেকে দেখা যাক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

পরের দিন সকালে সামীনা বানু ছেলেমেয়েকে বললেন, তোরা আজ থেকে আর সকালে মাস্টারের কাছে পড়তে যাবি না। শুধু রাত্রে পড়বি। মাস্টারের চাকরি হয়েছে। তোদেরকে দুবেলা পড়ালে নিজের পড়া করবে কখন?

লিলি স্যারের চাকরি হয়েছে শুনে মনে মনে খুশী হলে ও তার একটু অভিমান হল। ভাবল, স্যার চাকরির কথা আমাকে আগে না জানিয়ে মাকে জানাল কেন? চাকরাণীকে নাস্তা নিয়ে যেতে দেখে সে তার হাত থেকে নিয়ে স্যারের রুমে এল।

মকবুল লিলিকে নাস্তা নিয়ে আসতে দেখে বলল, তুমি কেন, চাকরাণী কোথায়?

লিলি মুখ ভার করে বলল, কেন তাতে কোন দোষ হয়েছে

নাকি?

ঃ দোষ হতে যাবে কেন? তুমি তো কোন দিন আননি, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

ঃ এবার থেকে আমি সব সময় আপনার খাবার নিয়ে আসব। একটা কথা জিজ্ঞেস করব উত্তর দিবেন?

ঃ বল কি জিজ্ঞেস করবে।

ঃ কবে আপনার চাকরি হল?

ঃ তা প্রায় মাস ছয়েক হবে।

ঃ মা কি তখন জেনেছে?

ঃ না, গতকাল আমি জানিয়েছি।

ঃ এতদিন জানান কি কেন?

ঃ দেখ লিলি, সব কেনর উত্তর সব সময় দেওয়া যায় না।

ঃ আমাকে অন্ততঃ জানাতে পারতেন।

ঃ শুধু তোমাদেরকে না, আমার আব্বা আম্মাকেও এখনো জানাইনি।

ঃ তার কারণটা বলবেন?

ঃ কারণটা বলতে পারলে চাকরির কথা প্রথমেই সবাইকে জানাতাম।

লিলি আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। তারপর স্যারের নাস্তা খাওয়া হয়ে যেতে বাসন পেয়ালা নিয়ে চলে গেল।

সামীনা বানু চাকরাণীর মুখে লিলি নাস্তা নিয়ে যাবার কথা শোনার পর থেকে রেগে আছেন। লিলিকে ফিরে আসতে দেখে রাগের সঙ্গে বললেন, তুই চাকরাণীর হাত থেকে নাস্তা নিয়ে মাস্টারকে খাওয়াতে গেলি কেন?

লিলি বলল, তাতে কি হয়েছে? এবার থেকে আমি সব সময় স্যারের খাবার নিয়ে যাব। কথা শেষ করে সে অন্যত্র চলে গেল।

মকবুলের পরীক্ষা কাছাকাছি এসে গেছে। সে চাকরির সময়টুকু ছাড়া সব সময় নিজের পড়া নিয়ে ব্যাস্তা রইল। মাগরিবের নামাযের পর শুধু ঘন্টা খানেক লিলি ও শাহিনকে পড়ায়। আর অনেক রাত পর্যন্ত নিজের পড়া পড়ে।

সামীনা বানু প্রতিদিন রাত এগারটার সময় এক গ্লাস গরম দুধ মাস্টারে রুমে পাঠিয়ে দেন। দুধটা লিলিই দিয়ে যায়। সকালে নাস্তার সঙ্গে দুটো হাফ বয়েল ডিম দেন। ভাল ভাল বাজার করে তরকারী রেঁধে ভাত খাওয়ান। খাবার পর দুতিন রকমের ফল পাঠিয়ে দেন। খাওয়ানর ব্যাপার নিয়ে মা মেয়ের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়।

মকবুল সে সব জানতে পেরেও না জানার ভান করে থাকে। এই সমস্ত দেখে শুনে সে খুব বিব্রত বোধ করে। নিজেকে অপরাধী মনে করে। কিন্তু তাদেরকে কিছু বলতে পারে না মাঝে মাঝে চিন্তা করে, সামীনা বানুর আহবান ফিরিয়ে দেওয়া সত্বেও কেন সে এতকিছু করছে? সে কি সত্যিই আমাকে খুব ভালবাসে? না তার ডাকে সাড়া দিইনি বলে আদর যত্ন করে জুতো মেরে প্রতিশোধ নিচ্ছে? এই সব কথা মনে করে এক এক সময় তার মন খারাপ হয়ে যায়।

একরাতে মকবুল পড়তে পড়তে হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, দেড়টা। চ্যাপারটা শেষ করে ঘুমাবে ভেবে আবার পড়তে শুরু করল। হঠাৎ মালাদের ঘরের দিকে জানালায় টক টক শব্দ শুনতে পেল। একবার সেদিকে তাকিয়ে মনের ভুল মনে করে পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আবার শব্দটা হল। মকবুলের মনে হল নিশ্চয় মালা। পড়া বন্ধ করে জানালা খুলতে মালাকে দেখতে পেল। বলল, কি ব্যাপার মালা, এতরাতে?

মালা বলল, কাল থেকে আপনাকে একটা কথা বলব বলে চেষ্ট করছি, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাই এই সময়টা বেছে নিলাম।

ঃ কিন্তু মালা, কেউ দেখে ফেললে কি হবে একবার ভেবেছ? ঠিক আছে, কি বলবে তাড়াতাড়ি বলে চলে যাও। নচেৎ কেউ জানতে পারলে কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না।

ঃ বাড়ীর কাউকে কিছু না বলে আব্বা তার মামাতো ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ের দিন করে ফেলেছে। সামনে মাসের পঁচিশ

তারিখে আমার বিয়ে। গতকাল শোনার পর থেকে আপনাকে জানাবার জন্য পাগল হয়ে ছিলাম। তারপর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আমি কি করব বলে দিন। আপনাকে ছাড়া কিছুতেই আমি অন্যের কাছে বিয়ে বসতে পারব না। আমার জীবন মরণ আপনার উপর নির্ভর করছে।

মালার কথা শুনে মকবুল চমকে উঠল। কি বলবে না বলবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করে চিন্তা করতে লাগল।

ঃ কিছু বলবেন তো, চুপ করে আছেন কেন?

ঃ দেখ মালা আমরা সবাই ভাগ্যের হাতের পুতুল। আমরা নিজেরা যা কিছু করতে চাই না কেন, ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। তুমি এত অস্থির হয়ে পড়ছ কেন? ধৈর্য্য ধর। বিয়ের দিন তো এখনো দেড় মাসের মত বাকি। দেখি চিন্তা করে এর মধ্যে কি করতে পারি? তুমি এখন যাও, পরে আমি তোমাকে জানাব।

ঃ আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। যা করার তাড়াতাড়ি করবেন।

তারপর সে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

সামীনা বাণু প্রাকৃতির ডাকে বাথরুমে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে খাটে উঠতে যাবেন এমন সময় বৈঠকখানার টিনের দেওয়ালে শব্দ হতে শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবলেন, চোর নয়তো? শুনেছেন, বাড়ীর লোকেরা জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে জানার জন্য চোরেরা নাকি প্রথমে কিছু শব্দ করে। দ্বিতীয়বার শব্দ হবার পর একটা বড় দা হাতে নিয়ে দরজার কাছে তৈরী হয়ে কান খাড়া করে রইলেন। একটু পরে বৈঠকখানার জানালা খোলার ও মাষ্টারের গলা পেয়ে দাটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এসে উঠোনের বেঁড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, মালা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মাষ্টারের সঙ্গে কথা বলছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি তাদের সব কথা শুনতে লাগলেন। মালা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সেখান থেকে বাউন্ডারী বেঁড়া মাত্র চার পাঁচ হাত দূরে। তাই সামীনা বাণু তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেলেনা। মালা চলে যাবার পর

তিনি নিজের রুমে ফিরে এলেন। এতদিনে তিনি বুঝতে পারলেন, মালার সঙ্গে কেন লিলি ঝগড়া হয়েছিল। আরো বুঝতে পারলেন, মালাকে মাস্টার ভালবাসে বলে তার ডাকে সাড়া দেয়নি। তাদের দুজনের উপর সামীনা বানু ভীষণ রেগে গিয়ে ক্রুদ্ধ বাঘীণির মত ফুঁসতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে বৈঠকখানার দিকে জানালা খুলে মাস্টার বলে ডাকলেন। তখন দুজনেরই ঘরে ডিম লাইট জালান ছিল।

মালাকে বিদায় করে জানালা লাগিয়ে মকবুল শুয়ে শুয়ে তার কথা চিন্তা করছিল। তাকে এখন যেমন বিয়ে করতে পারবে না তেমনি তার বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব ও দিতে পারবে না। প্রস্তাব দিলে এখানে কারো কাছে মুখ দেখান সম্ভব হবে না। একদিকে পরীক্ষার চিন্তা. আর একদিকে মালার চিন্তা তাকে খুব বেচায়েন করে তুলল। জানালা খোলার শব্দ পেয়ে তার চিন্তা ছিন্ন হয়ে গেল। সেদিকে তাকাবার সময় সামীনা বাণুর মাস্টার ডাক শুনতে পেল।

মকবুল উঠে মশারীর বাইরে এসে চৌকি থেকে নেমে বড় লাইট জ্জালাতে গেল।

সামীনা বাণু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বড় লাইট জালিও না।

মকবূল সুইচ থেকে হাত নামিয়ে নিল। সামীনা বাণুর গম্ভীস্বর স্বর ও তার সম্বোধন শুনে তার একটু ভয় হল। ভাবল, মালা যে এসেছিল এবং তার ও আমার মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে, তা কি উনি জেনেছেন? নিজেকে সংযত রেখে বলল, এমন সময় ডাকছেন কেন? যা কিছু বলার কাল বাড়িতে ডেকে বলতে পারতেন। অথবা চিঠি লিখে জানাতে পারতেন।

সামীনা বানু কথা বলতে পারছেন না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সামলার চেষ্টা করছেন, তবু পারলেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর সামলে নিয়ে ভিজে গলায় অথচ কর্কশ স্বরে বললেন, তুমি একটা কাপরুষ, ইতর ও জঘন্য প্রকৃতির ছেলে। তুমি এতবড় অকৃতজ্ঞ তা কল্পনা ও করি

নাই। এতদিন তোমাকে আমি ভূল বুঝেছি। আজ মালার সঙ্গে তোমার কথোপকথন শুনে সেই ভুল আমার ভেঙ্গেছে। তুমি আমার কাছে সাধু সেজে মালার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ। জান, তোমার চোখের একটু ঈশারায় আমি আমার প্রাণ উৎস্বর্গ করতে পারতাম। তোমাকে নিয়ে একটু শান্তি পাবার আশায় লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বেহায়ার মত মন খুলে সব উজাড় করে তোমার পায়ে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিলাম। আর তুমি তার বদলে যা করলে, তা কেউ কোনদিন করে না। ছিঃ ছিঃ তুমি এতবড় বেঈমান, আমার আশ্রয়ে থেকে, আমাকে পাগল করে, আমার হৃদয় নিংড়ান সেবা যত্ন নিয়ে আমাকে অপমান করে মালার সঙ্গে প্রেমেরখেলা খেলে চলেছ। তুমি জান না, নারীরা কতটা হিংস্র ও প্রতিশোধ পরায়না। আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে অভিসার করে বেড়াচ্ছ। আমি ও দেখে নেব, মালার সঙ্গে আবার কেমন করে দেখা সাক্ষাৎ কর। পারলে এক্ষুণী নচেৎ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পারগেন্ডারিয়া ছেড়ে চলে যাও। তা না হলে তোমার পরিনতির জন্যে তুমিই দায়ী হবে। আমাকে অবলা নারী ভেবে যদি আমার কথা অবহেলা করে এখনে অন্য কোন বাড়ীতে লজিং নাও, তা হলেও তার ফল অতিশিঘ্রী তুমি পাবে। তারপর তিনি জানালা লাগিয়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। মালা ও মাস্টারের কথোপকথন শুনে যতটা রেগে গিয়েছিলেন এই সব কথা বলে তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলতে লাগলেন, কেন, কেন, কেন আমি তাকে এসব কথা বলে চলে যেতে বললাম?

মকবুলের কাছে ঘটনাটা প্রথমে স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল, পরে যখন বাস্তব বলে বুঝতে পারল তখন নিজেকে খুব বড় অপরাধী বলে মনে করল। ভাবল, এরপর আর এখানে থাকা উচিৎ নয়। কালকেই চলে যেতে হবে। তারপর সে বইপত্র ও বেডিং বাঁধা ছাঁদা করতে লাগল। সব কিছু গুছিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, ফজরের আযান হতে আধঘন্টা বাকি। চৌকিতে বসে বেডিং এ

হেলান দিয়ে ভাবতে লাগল, এই সব নিয়ে কোথায় যাবে। ভাবতে ভাবতে এক সময় তন্দ্রাভূত হয়ে পড়ল। মোয়াজ্জেনের আযান শুনে তন্দ্রা ছুটে গেল। উঠে মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তারপর মসজিদ থেকে ফিরে এসে কাপড় পারে শহরে রওয়ানা দিল।

মকবুলের একজন অফিস কলিগ আলুবাজারে মেসে থাকে। তার কাছে এসে ভাগ্যচক্রে একটা সিট পেয়ে গেল। সিটের ভাড়া মাসিক সাতাশ টাকা। সিটভাড়া ঠিক করে অফিসে গিয়ে বড় সাহেবকে বলে পার- গেন্ডারিয়ায় ফিরে এল।

লিলি এসব কিছু জানতে পারেনি। সে সকালে স্যারের নাস্তা নিয়ে এসে দরজায় তালা দেখে ফিরে গিয়ে মাকে বলল, স্যারের রুমে তালা।

লিলির কথা শুনে সামীনা বানুর মন ধক করে উঠল। ভাবলেন, এত সকালেই না বলে চলে গেল নাকি? সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, রান্না ঘরে চাপা দিয়ে রেখে দে। কোথাও গেছে হয়তো। এলে নিয়ে যাস।

লিলি মায়ের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে বলল, আম্মা তোমার কি শরীর খারাপ?"

সামীনা বানু বললেন, হ্যাঁ, যা তুই এখন পড়তে বস।

লিলি নিজের রুমে গিয়ে পড়তে বসল।

দুপুরে লিলি স্যারের ভাত নিয়ে গিয়ে রুমের মাল পত্র গুছান দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার স্যার ? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

মকবুল বলল, বিশষ কারণে আমাকে আজই চলে যেতে হচ্ছে। সে জন্যে দুঃখিত।

ঃ আম্মা জানে?

ঃ হ্যাঁ জানেন।

প্রথম দিকে লিলি মাকে স্যারের প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নিতে দেখে মনে করত, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলে হয়তো এরকম করছে। পরে যখন পড়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ে স্যারের রুমে গেলে নিষেধ করত এবং খাওয়াতে যেতে

রাগারাগি করত তখন তার মনে সন্দেহ হয়। ক্লাস নাইনে উঠার পর মাকে আরো বেশী স্যারের যত্ন নিতে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল, মাও স্যারকে ভালবাসে। লিলি জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে আসছে, বাবার প্রতি মায়ের কোন টান নেই। কোন দিন মাকে বাবার সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখেনি। বাবাও যেন মাকে এড়িয়ে চলে। মাসে একবার এলে ও সকালের দিকে এসে বিকেলে চলে যায়। তাকে ও শাহিনকে যা একটু আদর করে। তাদের ভালমন্দ জিজ্ঞেস করে। যাবার সময় দুজনকে বিশ ত্রিশ টাকা দিয়ে বলে, কিছু খেতে মন চাইলে কিনে খাস। বাবা বাড়ীতে যখন থাকে না তখন মা বেশ হাসি খুশী থাকে। বাবা আসার সাথে সাথে মা খুব গম্ভির হয়ে যায়। তার ধারে কাছে বড় একটা যায় না। শুধু খাবার সময় থাকে। স্যার আসার পর থেকে মায়ের অনেক পরিবর্তন হতে দেখেছে। সব সময় হাসি খুশী থাকে। স্যারকে ভাল মন্দ খাওয়াতে পারলে যেন কত খুশী হয়।

এখন স্যারের কথা শুনে এবং তার মুখের চেহারা দেখে লিলির মায়ের মুখের চেহারার কথা মনে পড়ল। ভাবল, নিশ্চয় স্যারের সঙ্গে মায়ের কিছু একটা ঘটেছে। যার ফলে স্যার চলে যাচ্ছেন। স্যারের খাওয়া হয়ে যেতে বাসন পত্র নিয়ে যাবার সময় বলল, কখন যাবেন?

মকবুল বলল, আসরের নামায পরে যাব। তার আগে কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

লিলি মায়ের কাছে এসে বেশ রাগের সঙ্গে বলল, তুমি স্যারকে কি বলেছ, যার জন্যে স্যার চলে যাচ্ছেন।

সামীনা বাণুর মন মেজাজ গতরাত থেকে খুব খারাপ হয়ে আছে। মেয়েকে রাগের সাথে কৈফেয়েৎ চাইতে দেখে গর্জে উঠলেন, তোর সাহস তো কম না, চোখ রাঙ্গিয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছিস। তোদের স্যার একটা ইতর। সে ইতরের মত কাজ করেছে। তাই তাকে আমি চলে যেতে বলেছি। তুই আর কোন কথা বলবি না। এখান থেকে চলে যা।

মায়ের কথা শুনে লিলি আরো রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

তা বুঝতে পেরে সামীনা বানু আবার গর্জে উঠলেন, দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কথা কি কানে যাই নি? ভাল চাস তো এখান থেকে সরে যা, নচেৎ তোকে খুন করে ফেলব।

লিলি মায়ের এই রকম রুদ্রমূর্তি কখনো দেখেনি। কয়েক সেকেন্ড তার দিকে চেয়ে বেশ ভয় পেয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

বিকেলে মকবুল সামীনা বানুর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বলল, আপনি আমার জন্য যা করেছেন, দুনিয়াতে কেউ কারুর জন্য তা করেছে কি না জানি না। তার পরিবর্তে আমি আপনার মনে অনেক দুঃখ দিয়েছি। পারলে ক্ষমা করে দিবেন। আপনার দুঃখটা বুঝে ও তা দূর করতে না পেরে আমিও কম দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি না। আপনার কথা আমার অমৃত্যু মনে থাকবে।

সামীনা বানু ভিজে গলায় বললেন, সত্যিই তুমি তা হলে চলে যাচ্ছ? কত দুঃখে যে আমি তোমাকে গতরাতে ঐ সব বলেছিলাম এবং বলার পর যে কষ্ট পাচ্ছি, তা আল্লাহ পাক জানেন। তুমি আমার দুঃখ কষ্ট বোঝার মত বুঝলে না, তাই রাগ করে চলে যাচ্ছ। যাচ্ছ যাও তবে আমার মনে যে দুঃখ দিয়ে গেলে তার প্রতিফল তোমাকে একদিন পেতেই হবে। অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি চিরকাল অনুশোচনার ও আশান্তির আগুনে জ্বলবে।

মকবুল কোন কথা বলতে পারল না। মাথা নিচু করে বৈঠকখানায় ফিরে এসে চলে যাবার প্রস্তুতি নিল।

লিলি আজ ভাত খেতে পারেনি। স্যারকে দেবার জন্য একটা চিঠি লিখে রেখেছে। স্যারকে ঘরে এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এতক্ষণ আড়াল থেকে তাদের কথাবার্তা শুনেছে। স্যার চলে যেতে একটু পরে বৈঠকখানায় এসে তার হাতে চিঠিটা দিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, এটার উত্তর আশা করি না। এতদিন আপনার সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি. সে জন্যে মাফ চাইছি।

মকবুলের চোখে পানি এসে গেল। কিছু বলতে পারল না। সামলে নিয়ে যে ছেলেটাকে মাল পত্র নদীর ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য ডেকে এনেছে, তার মাথায় মাল পত্র তুলে দিয়ে নিজে একহাতে সুটকেস নিয়ে রওয়ানা দিল। আসার পথে মালার পাঁচ ছয় বছরের ছোট বোন তাকে একটা চিঠি দিয়ে বলল, আপা দিয়েছে।

মকবুল সুটকেশটা মাটিতে রেখে চিঠিটা পড়ল, আমার কোনো ব্যবস্থা না করে চলে যাচ্ছেন, বাধা দেবার ক্ষমতা থাকলে দিতাম। বিদায় বেলায় সকলে দোওয়া করে। কিন্তু আমি বদদোওয়া করছি, যদি আমার জন্যে কিছু না করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর গজবে পড়ে চিরকাল অশান্তিতে জ্বলবেন। আমার বদদোওয়া আজ না হলেও একদিন না একদিন আপনার উপর বর্তাবে।

ইতি

আপনার আকাঙ্খিত মালা

মকবুল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পত্র বাহককে ছোট্ট একটা চুমো দিয়ে বলল, তোমাদের মনে যে কষ্ট দিয়ে গেলাম তা অনিচ্ছাকৃত। নৌকায় উঠে লিলির চিঠিটা পড়তে লাগল–স্যার আপনাকে আমার বলার কিছু নেই। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, যদিও জানি কথাটা বলা উচিত হবে না তবু বলছি। মা যে আপনাকে অন্য দৃষ্টিতে ভালবাসেছে এবং সেই কারণে আপনি চলে যাচ্ছেন, আমি কল্পনা করতে পারি নাই। আমি আপনাকে ভালবাসি জেনেও মা তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। তাই আপনার সঙ্গে আমাকে মিশতে দেখলে খুব রাগারাগি করত। মা হয়ে মেয়ের এমন সর্বনাশ কেউ কোন দিন করেছে কিনা জানি না। যাই হোক আপনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন জেনে প্রথমে ভেঙ্গে পড়েছিলাম। পরে মায়ের মনের খবর স্পষ্ট জানতে পেরে সামলে নিয়েছি। ভেবেছি চলে যাওয়াটা আপনার জন্যে মঙ্গল। বেশী কিছু লিখে আপনার মনের দুঃখ আরো বাড়াব না। শেষমেস একটা কথা বলছি, মালাও আপনাকে খুব

ভালবাসে। তাকে আজ যখন বললাম, স্যার চলে যাচ্ছে শুনেছিস? তখন সে বলল, তোদের স্যার চলে যাচ্ছে তো আমার কি? তোদের স্যার বেঈমান। অমন স্যারের কথা শুনতে চাই না। তার কথাতেই বুঝতে পারলাম মালা আপনাকে খুব ভালবাসে। যাবার সময় হয়তো আপনি অনেকের অভিশাপ নিয়ে যাচ্ছেন। আমি কিন্তু তা করবো না। আপনি যে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেন, সে জন্যে দোওয়া করবো। যদি আমি আপনার মনে একটুও দাগ কেটে থাকি, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আর দয়া করে যদি ঠিকানা দেন, তাহলে আমি শহরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

ইতি

আপনার স্নেহের ছাত্রী লিলি

মকবুলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। ভাগ্যিস সে একটা নৌকা রিজার্ভ করে আসছিল, নচেৎ অন্য প্যাসেঞ্জাররা দেখলে কি ভাবত?

পরীক্ষার মাত্র দু সপ্তাহ আগে মকবুলের জীবনে এই বিপর্য্যয় ঘটে গেল। উপশহর ছেড়ে শহরে এসে চাকরি ও পড়াশুনা করতে লাগল। সে সবকিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করে পরীক্ষার পড়ায় মন দিল। কিন্তু পড়াশুনা করবে কি, প্রথম দু তিন দিন খুব খারাপ লাগল। ভালভাবে খেতে ও শুতে পারল না।

পাকের বেটী একদিন জিজ্ঞেস করল, আপনার কি হয়েছে? বাজার করেন না। চুপচাপ বসে থাকেন কেন? অন্যরা আপনার কথা বলাবলি করে।

মকবুল বলল, করতে দাও। তাদের মুখে তো হাত চাপা দিতে পারব না।

এখানে আসার তেরদিন পর পরীক্ষা আরম্ভ হল। মেসের নিয়ম রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বাতি অফ করে দেওয়া এবং সকাল ছটার আগে বাতি জ্বালান নিষেধ। মকবুলের ভোরে পড়ার অভ্যাস। কিন্তু মেসের আইন ভঙ্গ করে তাকে পড়তে দিতে মেসের অন্যান্য মেম্বাররা রাজী হল না। ফলে

পরীক্ষার পড়ার জন্য মকবুল খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। উপায়ন্তর না দেখে শেষে বাধ্য হয়ে রাত দশটার পরে এবং ফজরের নামাযের পরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে লাইট পোস্টের আলোতে পড়তে লাগল। এইভাবে পড়াশুনা করে সে পরীক্ষা দিল।

মকবুলের সঙ্গে মেসের এক জনের বেশ সখ্যতা গড়ে উঠে। তারই চেষ্টায় ঠাটারী বাজারে একটা টিউশনি পেল। দিন সাতেক পর টিউসনি করে রাত নটায় মেসে ফিরে দেখে গেট বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করে ও কোন ফল হল না। বাড়ীওয়ালা মেসের দোতলায় থাকেন। মকবুলের ডাকাডাকিতে তিনি এসে গেট খুলে দিলেন। বাড়ীটার দুটো গেট। একটা মেসের অন্যটা বাড়ীওয়ালাদের।

মকবুল রুমে ঢুকে বলল, কি ব্যাপার আজ এরই মধ্যে গেট লাগিয়ে দিয়েছেন কেন? এখানো তো দশটা বাজেনি। তা ছাড়া আমি বাইরে রয়েছি জেনে ও গেট লাগিয়ে দিলেন?

তাদের মধ্যে একজন বলল, বাজা বাজির কি আছে আমাদের কাজ শেষ, আমরা ঘুমাবো। গেট খোলা থাকলে চুরি হয়ে যাবে সে কথা নিশ্চয় জানেন। দিনে চাকুরি তার রাতে টিউশনি। আপনি ছাত্র মানুষ, অত টাকা কি করবেন? আমাদের অত টাকার দরকার নেই। যদি এখানে অসুবিধে লাগে, তা হলে অন্য পথ দেখুন।

মকবুল আর কথা না বাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের মাসে সে একা অন্য মেসের একটা রুম ভাড়া নিল। কয়েক দিন পর তালা ভেঙ্গে ঘড়ি ও অন্যান্য জিনিস পত্র চুরি হয়ে গেল। মকবুল চিন্তা করল, ওদের তিনজনের মধ্যে কার অভিশাপ ফলতে আরম্ভ করল, লিলির, লিলির মায়ের না মালার?

যথা সময়ে রেজাল্ট বেরোল। আশাতীত না হলে ও মকবুল সেকেণ্ড ডিভিশান পেল। ডিগ্রীতে এ্যাডমিসান নিয়ে একদিন পারগেণ্ডারিয়ায় গেল। ইচ্ছা, সকলের সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু কারো কাছ থেকে আগের মত ব্যবহার পেল না।

সবাই যেন তাকে কেমন বাঁকা চোখে দেখছে। জাফরকে জিজ্ঞেস করতে বলল, মালা বিয়ের কয়েক দিন আগে মাকে দিয়ে তার বাবাকে অমতের কথা জানিয়ে বলেছিল, তুই নাকি তাকে বিয়ে করবি বলেছিস। শুনে মালার বাবা বলেছিলেন, এ কথা সে আগে জানাল না কেন? এখন আর কিছু করার নেই। মালা খুব বেঁকে বসল। এই নিয়ে বেশ গোলমাল হয়। এমন কি তিনি মেয়েকে মারধোর পর্য্যন্ত করছেন। শেষে কেমন করে জানি বিয়েটা নিশ্চিন্তে হয়ে গেল। মালা তো এখন শ্বশুর বাড়ীতে। তোদের মধ্যে তাহলে মন দেওয়া নেওয়া হয়েছিল? মকবুল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ হয়েছিল। কিন্তু তুই তো জানিস, আমাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। এই সামান্য চাকরির ভরসায় বিয়ে করি কি করে? তাছাড়া তখন আমার ফাইনাল পরীক্ষা। তবে যাবার আগে এক সময় ওকে বলেছিলাম, তুমি যদি কোন রকমে বিয়েটা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করতে পার, তাহলে আমি এগিয়ে আসব।

জাফর বলল, মালা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি। তারপর জাফর আবার বলল, লিলির ও বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

মকবুলের লিলিকে দেখার শত ইচ্ছা হলেও তার মায়ের কথা মনে করে তাদের বাড়ীতে গেল না। জাফরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল।

পাঁচ

১৯৭৪ সালে দেশের জিনিস পত্রের দাম অগ্নিমূল্য হয়ে যেতে সাধারণ মানুষের অভাব অনটন দেখা দিল। খেটে খাওয়া মানুষগুলো এক বেলা না খেয়ে দিন কাটাতে লাগল । মকবুলদের বাড়ীতে ও অভাব দেখা দিল। মকবুল টিউশনির ও চাকরির বেতন থেকে নিজের খরচের টাকা রেখে বাকিটা বাবার হাতে দিয়ে আসে। ১৯৭৫ সালে দেশের অবস্থা কিছু স্থিতিশীলতা এলে মকবুল ঠাটারী বাজারে একটা দোকান ভাড়া নিয়ে কুটীর শিল্পের কারখানা করল। দেশ থেকে বড় ভাইকে নিয়ে এসে কারখানা চালাবার ভার দিল। মেজ ভাই বাবার সঙ্গে চাষ বাস নিয়ে রইল। আর ছোট পড়াশুনা করছে। এবার তাদের সংসারের ক্রমশঃ উন্নতি হতে লাগল। মকবুলের বাবা কিছু কিছু জমি জায়গা চার ছেলের নামে কিনছেন। যদিও জমি কেনার প্রায় সব টাকাটা মকবুলের রোজগারের। বাবা মনে কষ্ট পাবে বলে মকবুলের মনে ব্যথা লাগলে ও কোন প্রতিবাদ করেনি। বড় ভাইয়ের ও মেজ ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ভাইয়ের একটা চার পাঁচ বছরের ছেলে।

মকবুল যে ছাত্রটিকে টিউশনি পড়াত, সে ভাল রেজাল্ট করে উপরের ক্লাসে উঠলেও তার বাবা বেতন বাড়াতে চাইলেন না। তাই তাকে পড়ান বন্ধ করে দিল। তাদের দোকানের এক কাস্টোমারের থ্রুতে র‍্যাথকিনস্ট্রীটে দুটো মেয়েকে পড়াবার টিউশনি পেল। একজন এবছর ক্লান টেনে উঠেছে। আর একজন ক্লাস সেভেনে। তারা আপন দুবোন। তাদের আর কোন ভাই বোন নেই। বড়টার নাম হাসিনা আর ছোটর নাম ফরিদা।

দুবোনই দেখতে সুন্দরী । কিন্তু হাসিনা হাসিনাই। উজ্জ্বল ফর্সা-মাংসল শরীর-চোখ দুটো বেশ টানা টানা-ঘন কাল মিশমিশে লম্বা ভ্রু-খাড়া নাক-পুষ্ট বুক ও মানানসই নিতম্ব। বাবা মার প্রথম সন্তান। তা ছাড়া ছোট এক বোন ছাড়া ভাই নেই বলে ভীষন আদরে মানুষ হচ্ছে। খুব সরল। কিন্তু বেশ চটপটে ও বুদ্ধিমান। ওদের বাবা রাজমিস্ত্রী হলেও বেশ ভদ্র ও অমায়িক। অবস্থা স্বচ্ছল। দু কামরা পাকা রুমে ভাড়া থাকেন। রান্না ঘর, গোসল খানা ও পায়খানা সেপারেট। দেশের বাড়ী কুমিল্লার মতলব থানায়। বাংলা মটরের কাছে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোক বেশ মিশুক। মকবুলের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেন। প্রথম দিন মেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মিষ্টী ও চা খাওয়াবার পর মকবুলকে বললেন, আমার কোন ছেলে নেই। এদের দুজনকে ভালভাবে লেখাপড়া করিয়ে সৎপাত্রে দেবার আমার খুব ইচ্ছা। কোন সংকোচ না করে আপনি এদেরকে বোনের মত মনে করে পড়াবেন।

হাসিনাকে দেখে মকবুলের মালার কথা মনে পড়ল। সে সব সময় বড় চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে রাখত বলে তার শুধু মুখটা দেখেছে। আর হাসিনা শুধু ওড়না বুকের দুপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে হাসিনাকে মালার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী বলে মকবুলের মনে হল। প্রথম কয়েকদিন হাসিনা একটু জড়সড় হয়েছিল। তারপর ক্রমশঃ সহজ হয়ে এল।

মাসেক খানেক পর হাসিনা মকবুলের হাতে বেতনের টাকা দেবার সময় বলল, আজ থেকে আপনি প্রতিদিন ভাত খেয়ে যাবেন।

মকবুল বেশ অবাক হয়ে বলল, কেন?

ঃ আম্মা বলেছে।

ঃ তা কি করে হয়? তোমাদের পড়িয়ে বেতন নিচ্ছি, ভাত খাবার কথা কেন আসবে?

ঃ সে কথা আমি বলতে পারব না। আম্মা আমাকে বলতে

বলল।

হাসিনার মা দরজার আড়াল থেকে বললেন, বেতনের সঙ্গে খাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। বেতন যেমন পাচ্ছেন পাবেন। মেসে বেটীদের পাক খেয়ে কি আর তৃপ্তি পাওয়া যায়? তাই আমার ও হাসিনার আব্বার ইচ্ছা, অন্ততঃ রাত্রে এখানে খাবেন।

মকবুল বলল, দেখুন এটা ঠিক ভাল দেখায় না।

হাসিনার মা বললেন, এতে ভাল মন্দ দেখার কি আছে। আপনাকে লজিং রাখলে তো খেতে হত। আপনার কোন আপত্তি আমরা শুনব না।

মকবুল আর কি বলবে? একটু চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে প্রতিদিন না খেলে ও মাঝে মধ্যে খাব।

এরপর থেকে মকবুল ছাত্রীদের পড়িয়ে মাঝে মাঝে খেয়ে দেয়ে বাসায় ফিরে। কিছুদিন পর বুঝতে পারল, ওরা তাকে হাত করার জন্য খাতির যত্নের মাধ্যমে চেষ্টা করছে। দু একদিন ছাড়া ভাল ভাল রান্না করে খাওয়ায়। খাওয়ার পর দুতিন রকমের ফল ও না খাইয়ে ছাড়ে না। তাদের বাড়ী কোথায়, সেখানে কে কে আছে সবকিছু জিজ্ঞেস করে। এখানে কোথায় থাকে, এবং সঙ্গে নিজের কেউ থাকে কিনা জেনে নেয়।

আরো কয়েক মাস পর একদিন ভাত খাবার সময় হাসিনা বলল, স্যার এবার আপনি একটা বিয়ে করুন। বাসা নিয়ে আরামে থাকবেন। আর কতদিন কষ্ট করবেন? আপনার কোন কিছু দাবী থাকলে বলুন।

মকবুল বলল, দাবীর কথা পরে, আগে মেয়ে আমার মনের মত হতে হবে।

ঃ আমি একটা মেয়েকে জানি, যে আপনার মনের মত হবে।

ঃ তাই নাকি? তাহলে মেয়েটাকে দেখতে হয়।

ঃ তাতো দেখাবই। তার আগে দাবীগুলো বলুন। মেয়ের বাবা যদি সেগুলো দিতে না পারেন, তা হলে শুধু শুধু মেয়ে দেখিয়ে লাভ কি?

ঃ আমার দাবী মাত্র তিনটে, বাড়ী, গাড়ী আর সুন্দরী।
হাসিনা হেসে উঠে বলল, ঠিক আছে দুদিন পর জানাব।
দুদিন পর হাসিনা মকবুলকে বলল, মেয়ের বাবা আপনার দাবী মেনে নিয়েছেন। তবে মেয়ের একটা দোষ আছে, সে বোবা।
মকবুল বলল, তা হোক। তবু আমি রাজী।
ঃ তা হলে তো মেয়ে দেখাতেই হয়।
ঃ তুমি যখন সুন্দরী বলছ তখন আর আমার দেখার দরকার নেই।
হাসিনার ছোট বোন ফরিদা বলল, স্যার আপনি বোবা মেয়ে বিয়ে করবেন?
মকবুল বলল, বোবা মেয়ে তো ভাল।, সে সাড়ী, গহনা, স্নো, পাউডার, তেল, সাবান ও লিপিস্টিক কোন কিছু কিনে আনতে বলতে পারবে না। মারধোর করলেও বাবা মাকে বলতে পারবে না। আমি এই রকম মেয়ে চাই।
স্যারের কথায় দু বোন হাসতে লাগল। তাদের মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনছিলেন। তিনি ও হেসে উঠলেন।
ঐদিন ফেরার পথে মকবুল চিন্তা করল, নিশ্চয় হাসিনা নিজেই পাত্রী। তার মন বোঝার জন্য হয়তো হাসিনার মা হাসিনাকে এই সব কথা শিখিয়ে বলতে বলেছিলেন। আর সে জন্যেই বোধ হয় সেই সময় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কয়েক দিন অপেক্ষা করে দেখা যাক কি হয়।
তিন চারদিন পর বৃহস্পতিবারে পড়াবার সময় হাসিনার মা দরজার বাইরে থেকে মেয়েদেরকে বললেন, তোরা তো কাল নানার বাড়ী যাবি, স্যারকে সঙ্গে নিয়ে যাস।
হাসিনা বলল, হ্যাঁ স্যার আপনি ও আমাদের সঙ্গে চলুন না। কাল তো শুক্রবার অফিস বন্ধ। নানি আপনাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে বলেছে।
মকবুল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, অন্য একদিন যাব। কাল আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।
হাসিনা ম্লান মুখে বলল, সেখানে অন্যদিন গেলে হয় না?

মকবুল তার ম্লান মুখ দেখে তাকে খুশী করার জন্য বলল, মন খারাপ করছ কেন? বললাম তো অন্য একদিন যাব। কাল নিজের একটা খুব দরকারী কাজের জন্য সেখানে যেতে হবে।

কয়েক দিন পর হাসিনা বলল, কবে নানিদের বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন বলুন।

মকবুল বলল, সময় পাচ্ছি না। প্রত্যেক ছুটির দিন একটা না একটা কাজ বেরিয়ে পড়ে।

হাসিনা বুঝতে পারল স্যার যেতে রাজী নয়। কিন্তু তার মা হাল ছাড়ল না। ছলে বলে কৌশলে হাসিনাকে স্যারে সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মকবুল সব কিছু বুঝতে পেরে ও নিজেকে সামলে রেখেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে চিন্তা করে, মেয়েদের মধ্যে যারা প্রথম শ্রেণীর, হাসিনা তাদের দলে। যে কেউ এরকম মেয়েকে পেলে ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তার বাবা রাজমিস্ত্রী। শ্বশুর রাজমিস্ত্রী, মানুষের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জা লাগবে, এই কথা ভেবে সে মনকে মানাতে পারে নি।

প্রথম দিন সুন্দর ও সুঠামদেহী স্যারকে দেখে হাসিনার নব যৌবন মনে শিহরন অনুভব করেছিল। তারপর তার কথা বার্তায় ও আচার ব্যবহারে নিজের অজান্তে ভালবাসতে শুরু করে। আরো পরে যখন মা বাবার মনের ইচ্ছা বুঝতে পারল তখন সেই ভালবাসা আরো বেড়ে যায়। এবং স্যারের সঙ্গে স্নিগ্ধভাবে সব রকম কথা বলে। স্যার যে তাকেও ভালবাসে সেটা বুঝতে পারে। তাই স্যারের মন বোঝার জন্য সেদিন তাকে অন্য একটা মেয়ের কথা বলে বিয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিল, সাহস করে চিঠি দিতে পারে নি। কিন্তু অধিকার নিয়ে কথা বলতে ছাড়ে না।

একদিন ফরিদার শরীর খারাপ বলে পড়তে আসেনি। হাসিনা একা পড়ছিল। একসময় জিজ্ঞেস করল, ঐ দিন যে পাত্রীর কথা বলেছিলাম সে কে বুঝতে পেরেছেন?

মকবুল বলল, তোমার কি মনে হয়?

ঃ আমার যাই মনে হোক না কেন আপনি বুঝতে পেরেছেন কিনা বলুন।

ঃ আমি যাকে বুঝেছি তার সঙ্গে তোমার বর্ণনার মিল নেই। সে বোবা তো নই বরং বাকপটু ও খুব বুদ্ধিমান। তবে সে যে খুব সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঃ প্রমাণ দিতে পারবেন?

ঃ কেন পারব না, সে এখন আমার সামনে বসে কথা বলছে।

হাসিনা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বলল, পাত্রীর চেয়ে আপনি বেশী সুন্দর ও বুদ্ধিমান।

হাসিনার মা ভাত নিয়ে এসে দরজার বাইরে থেকে তাদের কথা শুনে খুব খুশী হলেন। মেয়ের কথায় মকবুলকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, হাসিনা স্যারের ভাত নিয়ে যাও।

খাওয়ার পর মকবুল বলল, সব তো বুঝলাম, এখন বল তুমি গ্রামের বাড়ীতে থাকতে পারবে কি না। ছোট সংসার ভালবাস, না বড় সংসার।

হাসিনা বলল, আমি গ্রামের বাড়ীতে ছোট বেলায় কতবার গিয়েছি মনে নেই। তবে বড় বেলায় একবার গিয়েছি। তাতে করে আমার কাছে শহর ভাল লাগে। সে সময় গিয়ে খুব অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশের বাড়ীতে পায়খানা নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার অবস্থা খারপ। শেষে আম্মা আমাকে নিয়ে পাশের বাড়ীতে গেলেন। তাদের টিনের একটা পায়খানা ছিল। আমি ও আম্মা সেখানে প্রাকৃতির ডাক সেরে তাড়াতাড়ি করে ঐদিনই ঢাকায় চলে আসি। আর ছোট সংসারের কথা যে জিজ্ঞেস করছেন, ছোট সংসার কে না চায়। বড় সংসারের অনেক ঝক্কি ঝামেলা। আচ্ছা আপনি একদিন বলেছিলেন, চাকরি করছেন, কুটীরশিল্পের একটা কারখানা ও করেছেন। এখানে বাড়ী করছেন না কেন? তাড়াতাড়ি একটা বাড়ী করার চেষ্টা করুন। তারপর বিয়ে করে বৌ নিয়ে সেখানে থাকবেন। মা বাবাকে দেশ থেকে নিয়ে এসে রাখবেন। অল্পক্ষন চুপ করে থেকে

জিজ্ঞেস করল, কত টাকা বেতন পান বলবেন?

মকবুল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সে কথা শুনে তোমার লাভ নেই।

ঃ নাই থাক, তবু বলুন।

ঃ বেতন কত পাই বলতে পারব না। তবে সেই বেতনে বাড়ী যে করতে পারব না সে কথা বলতে পারি।

ঃ আমার কথা শুনুন, চেষ্টা চরিত্র করে ঢাকায় অল্প কিছু হলেও জমি কিনুন। তারপর বাড়ী করার ব্যাপারে আব্বা আপনাকে সাহায্য করবে। তাহলে আর গ্রামের কথা চিন্তা করতে হবে না।

মকবুল বুঝতে পারল, হাসিনা গ্রামের বাড়ীতে যেতে রাজী নয়। বিয়ের আগে সে স্বামীকে ঢাকায় একটা বাড়ীর মালিক দেখতে চায়। সেই কথা চিন্তা করে সে মনে ব্যথা অনুভব করল। বলল, অতবড় ভাগ্য কি আমার হবে? দেখি আল্লাহ পাক আমার ভাগ্যে কি লিখেছেন।

বাসায় ফিরে ঘুমোবার সময় হাসিনাকে নিয়ে ভাবতে লাগল। তাকে বিয়ে করে তার বাবার ভাড়া বাসাতে থাকা সম্ভব নয়। আর নিজেও যে একটা বাসা ভাড়া করে হাসিনাকে নিয়ে থাকবো তাও সম্ভব নয়। এই বেতনে বাসা ভাড়া দেবার পর যা থাকবে, তা দিয়ে নিজেরা খাব কি আর মা বাবাকে দেব কি? তাদেরকে যে নিয়ে এসে আমাদের কাছে রাখব অত খরচ পাব কোথায়? এই সব ভাবতে ভাবতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

মকবুলের বেতন মাত্র ছশো টাকা। আর কারখানায় যা ইনকাম হয়, বড় ভাই তা দিয়ে নিজের খরচ চালায়। কোন দিন টাকা পয়সার হিসাব দেয় না। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে কারখানায় গিয়ে বড় ভাইয়ের কাছে আয় ব্যায়ের হিসাব দেখতে চাইল।

বড় ভাই বলল, তুই তো তবু একটা চাকরি করছিস। তাতে চালিয়ে নিতে পারবি। আমি কি করে খাব? তুই এই দোকানের

ইনকামের কোন দাবী করবি না। মকবুল মনে খুব আঘাত পেল। চাকরি ও টিউশনি করে বাবাকে দেওয়ার পরও সে কিছু কিছু জমিয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে এই কারখানা করেছে। বড় ভাইয়ের কথা শুনে মনে খুব দুঃখ পেলেও কিছু বলল না। হাজার হোক বড় ভাই বলে কথা। বলল, ঠিক আছে, আমাকে না দিয়ে যদি তুমি এটা চালিয়ে দাঁড়াতে পারো, তবে তাই হোক। তারপর সে আর কোনদিন বড় ভাইয়ের কাছে কারখানার টাকা পয়সা দাবী করে নি।

মকবুলের মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। প্রথম জীবনে মালা এসেছিল। ভাগ্যদোষে তাকে পেল না। তারপর এল হাসিনা। হাসিনাকে পেয়ে সে মালাকে না পাওয়ার দুঃখ কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু তার বাবা রাজমিস্ত্রী জেনে নিজেকে প্রথম দিকে সামলে রেখেছিল। ক্রমান্বয়ে সে হাসিনার প্রতি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার ও তার মা বাবার মতামত জানতে পেরে সিদ্ধান্ত নেয় তাকেই বিয়ে করবে। কিন্তু হাসিনার কথা শুনে যখন বুঝতে পারল সে গ্রামের বাড়ীতে যেতে চায় না এবং বিয়ের আগেই সে ঢাকাতে মকবুলের বাড়ী দেখতে চায় তখন ভাবল, ঐ রকম উচ্চভিলাসী মেয়েকে নিয়ে সুখী হওয়া যাবে না। পাখী যেমন ঝড়ের মধ্যে পড়ে বিধস্ত অবস্থায় বেঁচে থাকলে ও উড়বার ক্ষমতা থাকে না, তেমনি এখন মকবুলের অবস্থা। সে খুব চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় দিন কাটাতে লাগল।

একদিন পড়াবার সময় হাসিনা বলল, স্যার কদিন থেকে আপনার মন খুব খারাপ দেখছি। কি হয়েছে বলবেন?

মকবুল বলল, কি আর হবে, এই কদিন নিজের ভাগ্যকে নিয়ে চিন্তা করছি।

ঃ কেন স্যার কোন অঘটন ঘটেছে না কি?

ঃ না তেমন কিছু ঘটে নি। তবে যতবার আমি একটু সুখের পথ দেখতে পেয়েছি, ততবার ভাগ্য বিরোধিতা করেছে। এসব কথা থাক।

ঃ একটা কথা বলব স্যার?

ঃ বল।

ঃ আমার এক বান্ধবী কদিন থেকে বলছে, তোদের স্যার যদি আমাকে পড়াতো, তা হলে পরীক্ষায় রেজাল্ট খুব ভাল করতে পারতাম। ওনা স্যার অংকে কাঁচা। আপনি আমাকে যে সমস্ত অংক করে দেন, সেগুলো বাসায় নিয়ে গিয়ে দেখে দেখে করে।

আর একটা টিউশনি করলে বেশী আয় হবে ভেবে পড়াতে মন চাইলে ও মকবুল হাসিনার মন পরীক্ষা করার জন্য বলল, আমার সময় কোথায়?

ঃ কেন? আমাদেরকে পড়াবার পর ওকে পড়াবেন। ও অন্যান্য সাবজেক্টে খুব পাকা। শুধু অংকটা করালেই হবে। ওদের বাসা আমাদের বাসার কাছেই।

ঃ তোমার বান্ধবীর নাম কি?

ঃ সালেহা।

ঃ ঠিক আছে পড়াব। পরের দিন পড়ান শেষ হয়ে যেতে হাসিনা মকবুলকে সঙ্গে করে সালেহাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সকালে তাকে ও তার মাকে হাসিনা স্যারের মতামতের কথা বলেছে।

ছয়

সালেহা একটু রোগা ও লম্বা। যৌবনে পদার্পন করলেও তা এখানো সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় নি। গায়ের রঙ মাগুরে। দেখতে সুন্দরী না হলেও খারাপ না। সে মা বাবার এক মেয়ে। তাদের আসল বাড়ী ভৈরব। সালেহার বাবা ঘর জামাই হয়ে আছেন। শ্বশুর বেঁচে নেই। শুধু শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই। সালেহার মা তাদের একমাত্র সন্তান। সালেহার নানির দশ কাঠা জমির এক পাশে সাবেক কালের জরাজীর্ণ দোতলা পাকা তিন কামরা করে ছ কামরা বাড়ী। অন্য পাশে গোসলখানা ও পায়খানা। বাড়ীর পাশে রান্না ঘর। উপরের তলায় ভাড়াটিয়ারা আর নিচতলায় সালেহারা থাকে। সালেহার নানি পুরো জমিটা সালেহার মায়ের নামে লিখে দিয়েছেন। সালেহার বাবার নবাবপুর রোডে একটা ছোটমত চশমার দোকান। একটা পুরানো আশি সি, সি, ভ্যাস্পা আছে। প্রতিদিন সকাল নটায় ভাস্পা নিয়ে দোকানে যান। দুপুরে খেতে এসে বেলা তিনটের দিকে আবার যান। রাত দশটা এগারটার সময় বাসায় ফেরেন। দোকানে কি আয় হয় না হয়, তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। সংসারের দিকে কোন খেয়াল নেই। দিব্বি প্রতিদিন ধোপদোরস্ত সার্ট প্যান্ট পরে ভ্যাস্পা নিয়ে যান আর আসেন। সংসারের সব কিছু সালেহার মাকে সামলাতে হয়। মেয়ে যে বড় হচ্ছে, তার এবার যে বিয়ে দিতে হবে সেদিকেও খেয়াল করা প্রয়োজন মনে করেন না। সালেহার মা স্বামীকে অনেকবার সংসারের উন্নতির ব্যাপারে এবং বাড়ীটার সংস্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

সালেহাকে পড়াতে আরম্ভ করার বিশ পঁচিশ দিন পর একদিন

তার নানি পানের বাটা হাতে করে নিয়ে এসে মকবুলের পাশে বসে পান সেজে খেতে খেতে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। দেশের বাড়ী কোথায়, কি চাকরি করে, বেতন কত, মা বাবা আছে কিনা, বাড়ীতে কে কে আছে ইত্যাদি।

মকবুল মুরুব্বী মানুষ ভেবে সব কথার উত্তর ঠিকভাবে দিল।

কয়েক দিন পর আর একদিন পানের বাটা হাতে করে নিয়ে এসে নাতনির পাশে বসে পান সাজতে লাগলেন।

মকবুল ভাবল, আজ আবার বুড়ী কিছু জিজ্ঞেস করবে নাকি? বলল, আপনি কেমন আছেন?

নানি বললেন, আমার আর থাকা না থাকা। বয়স হয়েছে কবে বলতে কবে ডাক পড়ে তার ঠিক আছে? দোওয়া করি তোমাদেরকে আল্লাহ ভাল রাখুক। জামাই যদি মরার আগে এই বাড়ীটাকে আশপাশের আর পাঁচটা বাড়ীর মত সুন্দর করতে পারত, তাহলে শান্তির সঙ্গে মরতে পারতাম। বাড়ীটা দিন দিন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এসব দিকে জামাইয়ের কোন লক্ষ্য নেই। লাট সাহেবের ছেলের মত শুধু দু চাকার গাড়ী নিয়ে দোকানে দৌড়ায়। তবু যদি দোকান থেকে পাঁচ দশটাকা এনে সংসারে খরচ করত। তোমার মত যদি একটা ছেলে পেতাম, তাহলে আমার বাড়ীটার হেফাজত হত।

মকবুল জিজ্ঞেস করল, হেফাজত বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

নানি বললেন, সরকারের কাছ থেকে লোন নিয়ে বাড়ীটা পাঁচ ছয়তলা করে ভাড়া দিলে কত আয় হত? সংসারে খরচ করেও মাসে মাসে অনেক টাকা বাঁচতো। তুমি কি পারবে আমার বাড়ীটা হেফাজত করতে?

ঃ আমি কোন অধিকারে করব?

ঃ আমি যদি সেই অধিকার তোমাকে দিই?

মকবুল রসিকতা করে বলল, সে বয়স কি আপনার আছে?

নানি হেসে উঠে বললেন, তুমি তো খুব রসিক ও চালাক লোক? মকবুলের কথায় সালেহা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছিল। নানি তার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আবার বললেন,

আমার বয়স না থাকলেও আমার সতীনের এখন উঠতি বয়স. তার নামে সবকিছু করে দেব।

মকবুল নানির কথার প্যাঁচে পড়ে উত্তর দিতে না পারলেও তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল।

সালেহা লজ্জা পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। এই দেড় মাসের মধ্যে স্যারকে তার খুব ভাল লেগেছে। মনে মনে তাকে ভাল ও বেসে ফেলেছে। একদিন নানিকে মায়ের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলতে দেখে সে আড়াল থেকে তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারল, নানি মাকে স্যারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা বলছে। মা তখন বলল, অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে জামাই করতে পারলে আমরা ধন্য হয়ে যেতাম। নানি আবার বলল, আমি এই সম্পত্তি তোর নামে লিখে দিয়েছি। তুই যদি সালেহার নামে লিখে দিতে রাজী থাকিস, তাহলে আমি মাস্টারকে বাগাতে চেষ্টা করব। মা বলল, দেব না কেন? সালেহা ছাড়া আমাদের আর কে আছে, যে এই সম্পত্তি ভোগ করবে। সেই সব কথা শোনার পর সালেহা আরো বেশী স্যারকে ভালবেসে ফেলেছে।

সালেহা চলে যেতে মকবুল বলল, এখন আসি নানি।

মাস্টারের নানি ডাক শুনে খুশী হয়ে নানি বললেন, তোমার মুখে নানি ডাক শুনে আমি খুব শান্তি পেলাম।

কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ মকবুলের মুখ দিয়ে নানি শব্দটা বেরিয়ে গেছে। সে কোন কিছু ভেবে বলে নি। লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।

নানি বললেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে। তুমি একটু বস আমি আসছি বলে চলে গেলেন। একটু পরে নানি নাতনিতে ভাত তরকারী নিয়ে এসে মাস্টারের সামনে পরিবেশন করে বল-লেন, খেয়ে দেয়ে তারপর যাও।

মকবুল বলল, এই বুঝি আপনার কথা?

নানি বললেন, তোমার মত নাতিকে খাওয়াতে পারলে আমার খুব আনন্দ লাগবে। তুমি আজ থেকে আমার নাতি। আমি যে

তোমার নানি, সে কথা মনে রাখলে খুশী হব। তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে নানি আবার বললেন, মুরুব্বীদের কথা অমান্য করতে নেই। করলে বেয়াদবি হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) আদব কারীকে যেমন ভালবাসেন তেমনি বেয়াদবকে অপছন্দ করেন।

মকবুল এতক্ষন চিন্তা করছিল, ভাগ্য তাকে নিয়ে এ আবার কোন খেলা শুরু করল। আজ খেলে পরে যদি প্রতিদিন খেতে বলে।

নানি বললেন, কি হল ভাই, চুপ করে বসে রয়েছ কেন? খেয়ে নাও। আল্লাহ ও রসূলের (দঃ) কথা বললাম, তবু খাবে না?

সালেহা স্যারের দিকে চেয়েছিল। মকবুল তার দিকে চাইতে চোখে চোখ পড়ে গেল। মাথা নিচু করে বলল, খেয়ে নিন স্যার। না খেলে আমরা সবাই দুঃখ পাব।

অগত্যা মকবুল খেতে শুরু করল। নাতনি পাকঘর থেকে সবকিছু এনে দিতে লাগল আর নানি সেগুলো মাস্টারের পাতে তুলে দিতে লাগলেন।

খাওয়া শেষে মকবুল বলল, নানি, ভবিষ্যতে আজকের মত হলে তখন আর মুরুব্বীর কথা রাখা সম্ভব হবে না।

নানি বললেন, সে তখন দেখা যাবে।

বাসায় ফিরে মকবুল চিন্তা করল, নানির কর্থাবর্তায় বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সালেহাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান।

পরের দিন মকবুল হাসিনা ও ফরিদাকে পড়াতে গেলে হাসিনা জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনার নাকি একজন নানি হয়েছেন? তাকে একদিন আমাদের বাসায় নিয়ে আসবেন।

মকবুল বলল, তুমি কার কাছে শুনেছ?

হাসিনা বলল, যার কাছেই শুনি না কেন, কথাটা শুনে খুব খুশী হয়েছি। শুনেছি আপনার নানি নেই। নানি পেলেন, এটা তো ভাল কথা।

মকবুল আর কথা না বাড়িয়ে তাদেরকে পড়তে বলল। ওদেরকে পড়ান শেষ করে সালেহাকে পড়াতে গেল। সালেহা পড়তে

এলে জিজ্ঞেস করল, তোমার নানিকে যে আমি নানি বলেছি, সে কথা হাসিনা কি করে জানল? সালেহা বলল, হাসিনা মায়ের কাছে কোরান পড়ে। সকালে পড়তে এসে নানির কাছে শুনেছে।

মকবুল আবার জিজ্ঞেস করল, আর কিছু শুনেছে না কি?

সালেহা বলল, তা আমি বলতে পারব না।

মকবুল বলল, ঠিক আছে পড়।

কিছুক্ষণ পর নানি অন্য দিনের মত পানের বাটা হাতে করে পড়ার ঘরে নাতনির পাশে বসে পান সাজতে লাগলেন।

মকবুল একটু আগে সালেহাকে একটা অংক বুঝিয়ে করতে দিয়েছে। নানিকে আসতে দেখে একবার তার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

নানি এক খিলি পান মুখে দিয়ে বললেন, কার কথা ভাবছ?

মকবুল বলল, নানির কথা।

ঃ সত্যি বলছ?

ঃ মথ্যিা হঠাতে আর্মি বলি না।

ঃ দুদিনের নানি নয়তো আবার?

ঃ তা কেমন করে বলি। আপনারা বড়লোক। গ্রাম্য গরীব নাতি কি আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবো?

ঃ এমন কথা বলো না ভাই। তুমি শিক্ষিত লোক। তোমার মন যুগিয়ে হয়তো আমরা চলতে পারব না।

মকবুল কিছু না বলে সালেহার অংক করা দেখতে লাগল।

নানি পানের বাটা নিয়ে চলে গেলেন।

পড়ান শেষ হতে নানি আজ ও ভাত নিয়ে হাজীর হলেন।

মকবুল আপত্তি করে বলল, প্রত্যেক দিন এরকম করলে পড়াতে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

নানি বললেন,. আজ যখন এনেই ফেলেছি তখন খেয়ে নাও। পরে তোমার ইচ্ছা হয় খাবে, না হয় খাবে না। তবে পড়ান সম্ভব নয়, এমন কথা আর বলো না। বললে আমরা মনে কষ্ট

পাব। কারো মনে কষ্ট দিলে তাকে আল্লা মাফ করে না।
মকবুল আর কি করে, খেয়ে দেয়ে বাসায় ফিরল। তারপর থেকে মাসে অন্তত দশ পনের দিন মকবুলকে তাদের বাড়ীতে খেতে হয়।
এদিকে হাসিনার মাও দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কি করে মাস্টারের সঙ্গে হাসিনার বিয়ে দেওয়া যায়। তিনি ও প্রায় মকবুলকে না খাইয়ে ছাড়েন না। যে দিন হাসিনাদের বাসায় খায়, সেদিন সালেহাদের বাসায় খায় না। একদিন সে খুব বিপদে পড়ে গেল। সেদিন হাসিনাদের বাসায় খেয়ে সালেহাকে পড়াতে গেলে তারা ও খাবার জন্য বলল। মকবুল শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে খেতে চাইল না। কিন্তু নানি নাতিন নাছোড় বান্দা। তারা মাস্টারকে খাওয়াবে বলে মোরগ পোলাও রান্না করেছে। শেষে বাধ্য হয়ে মকবুলকে খেতে হল। নানি নাতিন জোর করে এমন খাওয়া খাওয়াল, পরের দিন তাকে কয়েকবার পায়খনায় ছুটতে হল। সেদিন অফিস ও যেতে পারল না।
মকবুল সালেহা ও হাসিনাকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেল। তারা দুজন যেমন তাকে বিয়ে করতে চায়, তেমনি তাদের গার্জেনরা জামাই করার জন্য লালায়িত। মকবুল সালেহার চেয়ে হাসিনাকে বেশী পছন্দ করে। হাসিনা তার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। তার মন বলে হাসিনাকেই বিয়ে করা উচিৎ। ওর মত মেয়ে খুব কম পাওয়া যায়। হোক সে রাজমিস্ত্রীর মেয়ে। আবার ভাবে হাসিনাকে বিয়ে করলে শহরে রাখতে হবে। শহরের মেয়ে গ্রামের অসুবিধে গুলো সহ্য করতে পারবে না। সেদিন তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। তাকে নিয়ে শহরে বাসা ভাড়া করে থাকলে যে সব অসুবিধেয় পড়বে তা চিন্তা করে মকবুলের মন খারাপ হয়ে যায়। ভেবে কোন কুল কিনারা পায় না।
হাসিনার মা একদিন মকবুলকে বললেন, আমার আম্মা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আপনি ফরিদাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাসায় যান।

মকবুল উনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। কিন্তু কি বলবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে মন রাখার জন্য বলল, ঠিক আছে একদিন যাওয়া যাবে।

হাসিনার মা খুশী হয়ে এরপর থেকে আরো ভাল ভাল বাজার করে মাস্টারকে খাওয়াতে লাগলেন। কোনদিন না খেলে মা মেয়ে রাগ করে। সেদিন তারা ও না খেয়ে থাকে। সে কথা পরের দিন মকবুল ফরিদার কাছে শুনে খুব চিন্তায় পড়ে যায়।

ওদিকে সালেহার নানি ও মা একদিন তাদের আত্মীয় স্বজনদের ডেকে মাস্টারের গুনগান করে তার সঙ্গে সালেহার বিয়ে দেবার কথা বলে মতামত জানতে চাইলেন।

উনারা আগে যখন মাস্টারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তখন তাকে একটা ভাল ছেলে বলে জেনিছিলেন। এখন সালেহ ত ও নানির কথা শুনে সবাই একবাক্যে রাজী হয়ে বল তার তোমরা যদি ছেলে হাতছাড়া করতে না চাও, তবে যত ত এবং ন তাড়ি সম্ভব কাজ সেরে ফেল।

সালেহার ছোট খালা তো বলেই ফেলল, আমার মেয়ে থাকলে আমি আজকেই কাজ সেরে ফেলতাম। আপা তুমি দেরী করো না। দেরী করলে ছেলে বেহাত হয়ে যাবে।

সকলের মতামত পেয়ে সালেহার মা, মাস্টারকে প্রস্তাব দেবার জন্য মাকে বললেন।

পরের দিন মকবুল পড়াতে এলে নানি তাকে বললেন, শুন ভাই, তুমি যখন আমাকে নানি বলে ডেকেছ তখন তোমার ভাল মন্দের দিকে লক্ষ্য করা আমার উচিৎ। তুমি মেসে থেকে কি খাও না খাও তাতে করে তোমার স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে না। প্রতিদিন পড়িয়ে এখানে খেয়ে যাবে। আর একটা কথা, এখানে যদি তোমার কেউ থাকে তাহলে বল, তার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। আর তুমি শুনতে চাইলে তোমাকেই বলব।

মকবুল বলল, আমার কাছেই বলুন। এখানে বড় ভাই আছেন। প্রয়োজন মনে করলে আমি তাকে বলব।

নানি বললেন, তোমার হাতে আমি সালেহাকে দিতে চাই।

আমার এই বাড়ি সালেহার মাকে দিয়েছি। তার তো আর কোন ছেলে মেয়ে নেই। একদিন সালেহাই সব কিছু পাবে। তবু তোমার ও সালেহার নামে লিখে দেব। সালেহার মায়ের ও তাই ইচ্ছা। সেই জন্যে সে তার সব আত্মীয় স্বজনদের মতামত জানিয়েছিল। তারা সবাই রাজী। এখন তোমার মতামত পেলে আমি সব কিছু করার ব্যবস্থা করব। কবে বলতে কবে আমার ডাক আসে, তাই তাড়াতাড়ি তোমাদের দুজনের হাত এক করতে চাই।

নানি যে একদিন এই রকম কথা বলবেন, মকবুল তা আগেই বুঝতে পেরেছিল। তাই অবাক না হয়ে জিজ্ঞেস করল, এসব কথা সালেহার বাবা জানেন?

নি বললেন, তাকে এখানো জানানো হয়নি। সংসারের কোন রেই তার মাথা ব্যথা নেই। তোমার মতামত পেয়ে াব। আমাদের সকলের ইচ্ছার কথা জেনে সে অমত করবে া।

মকবুল বলল, আপনারা এতকিছু করার আগে আমার মতামত নেওয়া উচিৎ ছিল।

নানি বললেন, তোমাকে দেখার পর থেকে সালেহার মা যেন হাতে চাঁদ পায়। তাই সে তোমাকে ছেলে হিসাবে পাবার জন্য আমাকে বলে। তোমাকে আমারও খুব ভাল লাগে। সালেহাকে তোমার দু একটা কথা জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলাম, সেও তোমাকে খুব পছন্দ করে। সেই জন্যে কয়েক দিন পর তোমার নাম, ধাম ও পরিচয় জেনে নিই। তারপর আত্মীয় স্বজনকে তোমাকে দেখিয়ে তাদের মতামত নেবার পর তোমাকে বললাম। তুমি লোন নিয়ে এই পুরোনো বাড়ী ভেঙ্গে ছয় সাততলার বিরাট বাড়ী করবে। তোমরা সুখে থাকবে। আমি ঐসব দেখে শান্তিতে মরতে পারব।

মকবুল বলল, এই হতভাগার কি এত সৌভাগ্য হবে?

নানি বললেন, তুমি হতভাগা হবে কেন? দোওয়া করি আল্লাহ তোমাকে সুখী করুক।

মকবুল বলল, ঠিক আছে দু একদিন পরে আপনাকে জানাব।

মেসে ফিরে মকবুল গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। সালেহাকে বিয়ে করলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। জমি পাওয়া গেলে নানির কথা মত লোন নিয়ে বিরাট বাড়ী করে ভাড়া দেওয়া যাবে। মাসে মাসে লোনের টাকা পরিশোধ করে ও মোটা টাকা বাঁচবে। রাস্তার পাশে জমি। কয়েকটা দোকান করে ভাড়া দিতে পারলে সেখান থেকে ও অনেক টাকা পাওয়া যাবে। নিজে ও একটা দোকানে ব্যবসা করতে পারব। শ্বশুর মশায় কর্মচারী নিয়ে ব্যবসা চালাবেন। আমি অফিসের পর দেখাশুনা করব। দেশের জমি জায়গা ভাইয়েদের কাছে বর্গা দিয়ে মা বাবাকে এখানে নিয়ে চলে আসব। এই সব চিন্তা করতে করতে হাসিনার কথা মনে পড়তে চিন্তাটা থমকে গেল। সালেহার চেয়ে হাসিনা পাত্রী হিসাবে যে শতগুন ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাসিনাকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়ার জন্য তার মন খুব ব্যাকুল। কিন্তু হাসিনার উচ্চ আকাঙ্খার কথা এবং তার বাবা রাজমিস্ত্রী, সে কথা মনে হলে মকবুলের মন ভীষন খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া হাসিনাকে বিয়ে করলে তার বাবা মা তাকে আর কত কি দেবে? সব মিলিয়ে বড় জোর বিশ ত্রিশ হাজার টাকা। আর সালেহাকে বিয়ে করলে বাড়ী গাড়ী সব হবে। সারারাত চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিল, সালেহাকে বিয়ে করাই যুক্তি সংগত।

সকালে অফিস যাবার সময় মকবুল কারখানায় গিয়ে বড় ভাইকে সালেহার নানির কথা বলে মতামত জানতে চাইল। বড় ভাই বললেন, কথাটা মন্দ নয়, তুমি ওখানে বিয়ে করতে পার। মকবুল মনে করেছিল, বড় ভাই হিংসা করে বিরোধীতা করবে। তাকে মত দিতে শুনে খুশী হয়ে অফিসে চলে গেল।

ঐদিন মকবুল সালেহাকে পড়াতে গিয়ে একসময় নানিকে একাকি বলল, আমার বড় ভাইকে আপনাদের কথা জানাতে তিনি মত দিয়েছেন।

নানি আনন্দিত হয়ে শোকর আলহামদু লিল্লাহ বলে বললেন, সালেহার মাকে খবরটা দিয়ে এক্ষুনী আসছি। কথা শেষ করে

তিনি এস্তপদে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বলেলেন, এখন ভালই ভালই আল্লাহ যেন কাজটা মিটিয়ে দেয়।

মকবুল চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখন আসি নানি।

নানি আঁৎকে উঠে বললেন, সে কি ভাত না খেয়ে যাবে কি? তা ছাড়া এত বড় সুখবর শোনার পর মিষ্টি মুখ না করিয়ে ছাড়ছিনা।

মকবুল শত আপত্তি করেও সফল হতে পারল না। আজ নানি নয়, ছাত্রী নিজেই সব কিছু রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসে পরিবেশন করে খাওয়াল। তারপর বিদায় দেবার আগে মিষ্টি মিষ্টি মুখ করাল।

দিন দুই পরে মকবুলকে অফিসের কাজে চট্টগ্রাম যেতে হল। অফিসে গিয়ে অর্ডার পেয়ে ঐ দিনই যেতে হয়। কাউকে বলার সুযোগ পেল না। সেখানে তাকে এ সপ্তাহ থাকতে হল।

এদিকে সালেহার মা মাস্টার আসছে না দেখে প্রতিদিন মকবুলের বাসায় লোক পাঠিয়ে খবর নেন।

চট্টগ্রাম থেকে ফেরার সময় মকবুল নিউ মার্কেট থেকে সখ করে ঝিনুকের নানা রকম কারুকার্য্য করা একটা মালা কিনে এনেছে। পড়াতে যাবার সময় সেটা পকেটে নিয়ে প্রথমে হাসিনাদেরকে পড়াল। তারপর সালেহাকে পড়াতে গেল।

এই কদিন কোথায় ছিল, না বলে যাওয়ার কারণ এবং আরো অনেক রকম প্রশ্ন করে নানি ও সালেহা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

মকবুল তাদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে নিস্তার পেল।

পড়তে পড়তে এক সময় সালেহা বলল, আগে জানলে ঝিনুকের মালা কিনে আনার জন্য আমি টাকা দিতাম। শুনেছি চট্টগ্রামে খুব সুন্দর সুন্দর ঝিনুকের মালা পাওয়া যায়।

মকবুল বলল, তাই নাকি? তারপর পকেট থেকে মালাটা বের করে বলল, দেখ দেখি এটা তোমার পছন্দ হয় কিনা।

সালেহা মালাটা হাতে নিয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে স্যার একটু আসছি বলে দৌড়ে পাশের রুমে গিয়ে মাকে মালাটা

দেখিয়ে বলল, স্যার এই কদিন চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমার জন্যে কিনে এনেছেন।

সালেহার মা আনন্দিত হয়ে মালাটা দেখে বললেন, বাঃ বেশ সুন্দর মালা তো? তোর পছন্দ হয়েছে?

সালেহা বলল, বারে এত সুন্দর মালা পছন্দ হবে না কেন?

সালেহার মা বললেন, জ্ঞানী ছেলে। সেই রকম কাজ দেখে গর্বে আমার বুক ভরে গেছে।

নানি এশার নামায পড়ে অজিফা পড়ছিলেন। নাতনির কথা শুনে তাড়াতাড়ি অজিফা শেষ করে মালা দেখে খুব খুশী হলেন। দোওয়া করলেন "আল্লাহ গো, তুমি সব সময় ওদের দুজনকে খুশীতে রেখ।" তারপর নাতনির গলায় মালাটা পরিয়ে দিয়ে বললেন, যা মাস্টারকে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে সালাম কর। বড়রা কিছু খুশীর জিনিস দিলে তাকে সালাম করতে হয়। মেয়েকে মাস্টারের জন্যে ভাত বাড়তে বলে সালেহাকে আবার বললেন, সালাম করে মাস্টারকে যেতে দিবি না। ভাত খাইয়ে ছাড়বি। পড়ার ঘরে এসে স্যারকে সালাম করতে সালেহার খুব লজ্জা পেতে লাগল। তবু ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল।

মকবুল তার দুহাত ধরে তুলে বলল, একি করছ? এসব করতে কে বলেছে? স্যার তার হাত ধরতে সালেহা একটু কেঁপে উঠল। আরো লজ্জা পেয়ে বলল, হাত ছাড়ুন মা ভাত বাড়ছে নিয়ে আসি।

মকবুল তার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, মালাটা তোমাকে খুব সুন্দর মানিয়েছে।

সালেহা এক পলক তা মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে ভাত নিয়ে ফিরে এল।

পরের দিন সালেহাকে পড়াতে এসে মকবুল দেখল, তার বসার চেয়ারে কয়েক রকমের ফুল ছিটান আর টেবিলের উপর একটা তাজা লাল গোলাপ। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার ফুলের এত ছড়াছড়ি কেন?

সালেহা হাসি মুখে বলল, কেন আবার আপনি কি ফুল ভালবাসেন না?

মকবুল টেবিল থেকে গোলাপ ফুলটা হাতে নিয়ে একবার শুঁকে বলল, কে না ফুল ভালবাসে? আমার তো মনে হয়, যে ফুলকে ভালবাসে না, সে নির্মম। তারপর চেয়ার থেকে দুটো গেঁদা ফুল নিয়ে সালেহার মাথার দুপাশের চুলে গুঁজে দিয়ে বলল, আজ এই পরিবেশটা আমাকে খুব আনন্দ দিচ্ছে তাই তোমার মাথায় ফুল দিয়ে দোওয়া করছি, "আল্লাহ পাক যেন তোমার দোষত্রুটিগুলো পরিবর্তন করিয়ে এই ফুলের মত সকলের কাছে আদরিনী করে তোলেন।"

সালেহা আনন্দিত হয়ে স্যারকে আবার কদমবুসি করতে গেল। মকবুল বাধা দিয়ে বলল, আমাকে আর কদমবুসি করতে হবে না। এবার পড়তে বস।

সালেহা বাধা মানল না। কদমবুসি করে বলল, এতে কি আপনি অসন্তুষ্ট হন?

মকবুল বলল, তা নয়, এসব করার সময় এখনো হয়নি। তুমি মনে কিছু করো না। এবার বই খাতা বের করে দেখি।

সালেহা বই খাতা এগিয়ে দিয়ে বলল, দুটো অংক পারিনি।

মকবুল অংক দুটো বুঝিয়ে দিচ্ছে আর সালেহা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একাবার তার দিকে চেয়ে মকবুল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, তুমি তাহলে এদিকে কিছু দেখ নি?

সালেহা বলল, দেখছিলাম তো, আপনি ডিস্টার্ব করলেন।

মকবুল মিষ্টি ধমক দিয়ে বলল, সাহস খুব বেড়ে যাচ্ছে না?

সালেহা মা ও নানির কথা শুনে বুঝেছে তাদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। তাই সাহস করে বলল, সাহস বাড়ার সময় ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, বাড়বে না?

মকবুল আর কিছু না বলে অংক দুটো আবার বুঝিয়ে দিল।

এরপর থেকে সালেহা স্যারের সব কিছু লক্ষ্য রাখতে লাগল। তার ময়লা জামা কাপড় কাজের মেয়েকে দিয়ে স্যারের বাসা থেকে আনিয়ে নিজে পরিস্কার করে স্ত্রী করে দেয়।

একদিন সালেহার খুব জ্বর। পড়বার মত অবস্থা নয়। স্যার পড়াতে এলে তবু পড়তে বসল।

মকবুল তার দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে?

ঃ আজ সকাল থেকে জ্বর হয়েছে। মাথা ও খুব ব্যথা করছে। পড়তে পারব না। শুধু হোমটাস্কের খাতাগুলো দেখে দিন। কিন্তু না খেয়ে যাবেন না।

ঃ ঠিক আছে, আজ পাড়ান থাক। তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। কিছু ওষুধ খেয়েছ?

ঃ আম্মাকে ওষুধের কথা বলতে বলল, একদিনের জ্বরে ওষুধ খেতে নেই। কাল যদি না কমে তখন দেখা যাবে। একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না তো?

ঃ বল না কি বলবে, মনে করার কি আছে।

ঃ মাথা ব্যথার দুটো টেপ এনে দেবেন?

ঃ কেন দেব না। একটু বস এনে দিচ্ছি বলে মকবুল উঠে দাঁড়াল। সালেহা একটা টাকা স্যারের দিকে বাড়িয়ে বলল, টাকাটা নিন স্যার।

টাকা লাগবে না বলে মকবুল বেরিয়ে গেল। সে একটা ওষুধের দোকনে গিয়ে কিছু ওষুধ পত্র ও টেপ কিনে নিয়ে এসে দেখল, টেবিলে খাবার সাজিয়ে সালেহা বসে আছে। বলল, তুমি আজ অসুস্থ, এসব না করলে চলত না? এস আমি তোমার কপালের দু-পার্শের রগে টেপ লাগিয়ে দিই।

সালেহা চুপ করে বসে রইল।

মকবুল ওষুধগুলো টেবিলের এক পাশে রেখে টেপ লাগিয়ে দেবার সময় কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারল, জ্বর প্রায় একশো তিনের উপর। ওষুধ খাবার নিয়ম বুঝিয়ে দিয়ে বলল, কিছু খেয়ে ওষুধ খাবে। তারপর মাথায় বেশ কিছুক্ষণ পানি দিও। তা হলে জ্বর ও মাথা ব্যথা কমবে।

সালেহার মা ও নানি মাস্টারকে এসেই চলে যেতে দেখে ঘরে এসে সালেহাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাস্টারকে না খাইয়ে যেতে দিলি কেন?

সালেহা বলল, স্যার মাথা ব্যাথার টেপ আনতে গেছেন।

উনারা সেই অবসরে মাস্টারের খাবার দিয়ে ফিরে গিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। মকবুল ফিরে আসার পর উনারা এতক্ষন দরজার বাইরে থেকে মাস্টারের কথা শুনছিলেন। সালেহার মা মেয়ের প্রতি মাস্টারের ভক্তি দেখে খুশী হয়ে মাকে বললেন, তুমি গিয়ে মাস্টারকে খেতে বল, আমি উপরি ভাত তরকারী নিয়ে আসি।

নানি ও খুশী হয়েছেন। মাস্টারের কথা বলা শেষ হতে রুমের ভিতরে এসে বললেন, মনে হয় কতিদিন দুজনে সংসার করছে। আমাকে ছাড়াই তোমরা এতদূর এগিয়েছ জেনে খুব খুশী হলাম। ভাবছি বিয়ের আগেই যদি এত কিছু, বিয়ের পর কারো কিছু হলে তোমরা কি করবে কি জানি।

সালেহা লজ্জা পেয়ে বলল, আমি স্যারকে শুধু মাথা ব্যাথার টেপ আনতে বলে টাকা দিতে চেয়েছিলাম। স্যার টাকা তো নিলেনই না, তার উপর এতগুলো ওষুধ কিনে এনেছেন।

নানি বললেন, তাই তো ঐ কথা বললাম। এখন ওষুধে কত টাকা লেগেছে জেনে নিয়ে মায়ের কাছ থেকে এনে দাও।

মকবুল বলল, টাকা দেওয়া লাগবে না। দশটা না পাঁচটা না ও আমার একমাত্র ছাত্রী। তার জন্যে না হয় কয়েকটা টাকা খরচ করলাম।

সালেহা বলল, ঠিক আছে, আপনি ভাত খেয়ে নিন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মকবুল বলল, আজ ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না। তোমাকে যা বললাম তাই কর।

সালেহা বলল, আপনি ভাত না খেলে আমিও ওষুধ খাব না।

নানি হাসতে হাসতে তাদের মান অভিমান ভাঙ্গিয়ে দুজনকে ভাতও ওষুধ খাওয়ালেন।

মকবুল হাসিনা ও ফরিদাকে রেগুলার পড়াচ্ছে। তারা এসব ব্যাপার কিছুই জানতে পারে নি। একদিন হাসিনা বলল, স্যার এবার আপনার বিয়ে করা উচিৎ। কত দিন আর কষ্ট করে থাকবেন।

মকবল বলল, বিয়ে সাদি তকদ্বীরের ব্যাপার। তকদ্বীর আল্লাহ

পাকের হাতে। তিনি যখন রাজী হবেন তখন হঠাৎ করে হয়ে যাবে।

ঃ তবু তো নিজেদের চেষ্টা তদবীর করতে হয়।

ঃ তোমার কথা অবশ্য ঠিক। সে ব্যাপারে আব্বা আম্মা নিশ্চয় কিছু করছেন।

ঃ আপনার আব্বা আম্মার দেখা মেয়েকে যদি আপনার পছন্দ না হয়? আমার মতে নিজের পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে করা উচিৎ।

ঃ তোমার কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু কি করব বল, নিজে পছন্দ করলে কি হবে, তকদ্বীরে না থাকলে কি করার আছে। তাই তকদ্বীরের উপর নির্ভর করে আছি।

হাসিনা কিছু বলতে না পেরে চুপ করে গেল।

সাত

সালেহা একসপ্তাহ জ্বরে ভুগল। মকবুল প্রতিদিন হাসিনাদেরকে পড়িয়ে তাদের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিয়েছে। আজ পড়তে পড়তে সালেহা বলল, স্যার আপনার কলমটা দেবেন। কলমটা আমার খুব পছন্দ।

মকবুল বুক পকেট থেকে কলমটা নিয়ে তার হাতে দিয়ে বলল, দিলাম।

সালেহা আজ স্কুল গিয়েছিল। ফেরার পথে নিজের জমান টাকা থেকে একটা পাইলট কলম কিনে এনেছে স্যারকে উপহার দেবার জন্য। জ্বর হয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল, স্যার তাকে ঝিনুকের মালা উপহার দিয়েছেন আমারও তাকে কিছু দেওয়া উচিৎ। তাই কলমটা কিনেছে। সরাসরি দিতে তার খুব লজ্জা করছিল বলে প্রথমে স্যারের কলমটা চায়। স্যার কলমটা দেবার পর বলল, আপনার তো সব সময় কলম দরকার, অসুবিধে হবে না?

মকবুল বলল, আমি আর একটা কিনে নেব।

সালেহা কিনে আনা কলমটা স্যারের হাতে দিয়ে বলল, দেখুন তো এই কলমটা কেমন?

মকবুল বলল, খুব দামী কলম, এটা পেলে কোথায়?

ঃ দামী টামি বুঝি না, পছন্দ হয়েছে কিনা বলুন।

ঃ এত সুন্দর ও দামী কলম পছন্দ হবে না কেন?

ঃ তাহলে ওটা আপনাকে নিতে হবে। আপনার জন্য পছন্দ করে কিনেছি।

মকবুল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বলল, শুধু শুধু এত

টাকা দিয়ে কিনতে গেলে কেন?

ঃ আপনি যে কারনে ঝিনুকের মালা কিনেছিলেন, আমি ও সেই কারণে কিনেছি।

ঃ তোমাকে আমি একটা ভাল কলম কিনে দেব। ওটা অনেক পূরান।

ঃ না, আর কিনে দিতে হবে না। এটা আমার খুব পছন্দ।

আর একদিন সালেহা মকবুলকে বলল, স্যার আপনার আম্মাকে একবার ঢাকায় নিয়ে আসুন। আমাদের বাসায় বেড়িয়ে যাবেন। উনাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছা হয়।

মকবুল বুঝতে পারল, সালেহা আমাদের সব খবর নানির কাছ থেকে নিয়েছে। বলল, নিশ্চয় নিয়ে আসব।

কয়েক দিন পরে সালেহার আত্মীয় স্বজনেরা একদিন সালেহাদের বাসায় একত্রিত হল বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য। সালেহার বাবা এতকিছু শোনেন নি। সব কথা শোনার পর তিনি অমত প্রকাশ করে বললেন, আমি এখন সালেহার বিয়ে দেব না। ওকে আরো লেখাপড়া করিয়ে ভাল ছেলে দেখে বড় ঘরে বিয়ে দেব। আমি ঘর জামাই হয়ে আছি। তার উপর আমার জামাইকে ঘর জামাই করে রাখলে, লোকে নানা রকম কথা বলবে।

মকবুল খুব ভাল ছেলে, দেশে তার বাবার নাম ডাক আছে, বনেদি ঘর, অবস্থা ও খারাপ না, চাকরি ওয়ালা ছেলে, এরকম ছেলে সহসা পাওয়া যায় না, এই সব বলে সবাই সালেহার বাবাকে বোঝাল। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। এই নিয়ে সকলের সঙ্গে খুব তর্ক বিতর্ক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্বামী রাত্রে ফিরে এলে সালেহার মা তাকে অনেক বোঝালেন। তাতে কাজ না হতে বললেন, সালেহা মাস্টারকে ভালবাসে, আর মাস্টার ও সালেহাকে ভালবাসে। ওদের বিয়ে না হলে দুজনেই সারা জীবন অশান্তি ভোগ করবে।

সালেহার বাবা কথাটা শুনে আরো রেগে গেলেন, বললেন,

এই জন্যে বয়স্ক মেয়েদের ছেলে মাস্টার রাখতে নেই। যে ছেলে ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করে, সে ছেলে যে কত ভাল তা আমার জানা আছে। তুমি আর এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না। মেয়েকে একটা লম্পট ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব না।

পরের দিন আত্মীয় স্বজনেরা সালেহার বাবাকে বলল, আপনাকে ছাড়াই আমরা এই কাজ সমাধা করব।

সালেহার বাবা খুব রেগে গিয়ে বললেন, তা হলে তার পরিণতি খুব খারাপ হবে। আমার মেয়ের বিয়ে আমি যখন খুশী যেখানে ভাল মনে করব দেব, আপনারা মাথা গলাবার কে? যান যে যার বাড়ী চলে যান।

এই কথা শুনে উনারা অপমান বোধ করে ফিরে গেলেন।

সালেহার মা ও নানি খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। আর সালেহা সব কিছু দেখে শুনে চোখের পানিতে বুখ ভাসাতে লাগল।

এই নিয়ে সালেহার মা বাবার মধ্যে কলহ শুরু হল। শেষে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

নানি মেয়ে জামায়ের অবস্থা দেখে মনে আঘাত পেলেন। মাস্টারের কথা ভেবে খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। মাস্টার যদি সালেহার বাবার অমতের কথা জানতে পারে, তাহলে কি করবে?

মকবুল এসব ব্যাপার জানতে পারল না। একদিন সালেহাকে পড়িয়ে ফেরার সময় নানি ভিজে গলায় বললেন, আমি যদি মরে যেতাম তাহলে একটু শান্তি পেতাম।

মকবুল বলল, কি ব্যাপার নানি, আপনি এমন কথা বলছেন কেন?

নানি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সালেহার বাবার অমতের কথা এবং সেই নিয়ে মেয়ে জামাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের কথা বলে মকবুলের দুটো হাত ধরে বললেন, তুমি ভাই মনে কিছু করো না। জামাই রাজী না হলে ও আমরা যেমন করে হোক তোমাদের দুজনকে এক কারার ব্যবস্থা করব।

কথাটা শুনে মকবুলের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ফেরার পথে

চিন্তা করতে রাগল, সালেহার বাবার অমতের পিছনে কি কারণ থাকতে পারে। হঠাৎ তার মনে হল বাড়ীও জায়গা মেয়ে ও জামাইয়ের নামে লিখে দিলে উনার নিজের বলে কিছু থাকবে না। সারা জীবন মেয়ে জামাইয়ের দয়ার উপর নির্ভর করে কাটাতে হবে। কথাটা ভেবে মকবুলের মন সালেহার বাবার উপর বিরূপ হয়ে উঠল।

পরের দিন পড়াতে এসে সালেহার অবস্থা দেখে মকবুল বলল, তোমাদের আর দোষ দেব কি, আসলে আমার ভাগ্যটাই এরকম। যখনই কোন ভাল কাজ করার সময় আসে তখনই ভাগ্য আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে।

সালেহার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। সে কোন কথা বলতে পারল না।

এরপর আর মকবুল সালেহাকে পড়ান বন্ধ করে দিল।

সালেহাদের বাসায় শোকের ছায়া নেমে এল। একদিন সালেহার মা লোক পাঠিয়ে মকবুলকে ডেকে পাঠালেন।

মকবুল ভারাক্রান্ত মনে তাদের বাসায় এল।

সালেহার মা দরজার আড়াল তেকে সব সময় কথা বলেন। আজ রুমের ভিতরে এসে বললেন; দেখ বাবা আমার কোন ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। তোমাকে ছেলে হিসাবে পেতে আমার খুব ইচ্ছা। সে কথা তুমি নিশ্চয় এতদিনে বুঝতে পেরেছ। সালেহার ও তার নানীর মনের কথাও জান। আমি তোমার চাচাকে যেমন করে হোক রাজী করাব। তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। তাতে যা টাকা পয়সা লাগে আমি দেব।

মকবুল বলল, বলুন কি করতে হবে।

সালেহার মা বললেন, তুমি কোন হুজুরের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলে বলবে, এই বিয়েতে যাতে করে তোমার চাচা রাজী হন, সে রকম তাবিজ দিতে। আর তুমি পড়াতে আসা বন্ধ করে দিলে কেন?

মকবুল বলল, আপনারা বলেছিলেন, সব কিছু ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। এখন যে পরিস্থিত হয়েছে, তারপয় আর এ বাসায়

আসা আমার ঠিক নয়। আশ পাশের সকলে ঘটনাটা জেনে গেছে। আমি কোন মুখে আসব। তবে আপনি যে কাজ করে দেবার জন্যে বললেন, তা করে দেব।

কয়েক দিনের মধ্যে মকবুল এক মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে তাবিজ করে এনে সালেহার মায়ের হাতে দিল। উনি মকবুলকে কত খরচ হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন।

মকবুল বলল, খরচের কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। তারপর বিদায় নিয়ে ফিরে এল।

সালেহার মা ও নানি আরো অনেক জায়গা থেকে তাবিজ করে এনেও কোন ফল হল না। শেষে কোন উপায় না পেয়ে সালেহার মা আবার একদিন মকবুলকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তুমি সালেহাকে কাজী অফিসে বিয়ে করে দেশের বাড়ীতে তোমার মায়ের কাছে রেখে এস। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার চাচার কথা ভেবো না, তাকে আমি সামলাব।

মকবুলের কথাটা পছন্দ হলেও চিন্তা করল, বিয়ের আগে দেনা পাওনা আদায় না হলে, বিয়ের পরে সে সব আদায় করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। বিয়ের পর যদি সালেহার মা মেয়ে জামাইয়ের নামে জায়গা ও বাড়ী লিখে না দেন, তা হলে পরে কি আদায় করতে পারব? এমনি সালেহার বাবা এ বিয়েতে একদম রাজী নয়।

মকবুলকে চুপ করে ভাবতে দেখে সালেহার মা বলল, কিভাবছ বাবা, কিছু বলছ না কেন?

মকবুল বলল, শুভ কাজ দশজনকে জানিয়ে সামাজিকভাবে করা উচিৎ।

ঃ সামাজিক কাজ পরে হবে। আমি যা বললাম তার ব্যবস্থা কর।

ঃ দেশে আমার আব্বার একটা সুনাম আছে। তাছাড়া আব্বা

আম্মাকে না জানিয়ে বিয়ে করে হঠাৎ সালেহাকে সেখানে নিয়ে গেলে, তারা যেমন দুঃখ পাবেন তেমনি রেগে ও যাবেন। আমদেরকে ঘর থেকে বার করেও দিতে পারেন।

ঃ আমি তোমার বাবা মার কাছে পত্রে বিস্তারিত সবকিছু লিখে তোমার হাতে দেব।

মকবুল ভাবল, এদের মতলব খারাপ। তাই মেয়ের মা নিজেই গোপনে তাড়াতাড়ি বিয়ের কাজ সারতে চান। বেশ রেগে গিয়ে বলল, আমি চোরের ছেলে নই যে, আপনার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাব।

এই কথায় সালেহার মা মনে খুব ব্যথা পেলেন। কোন কথা না বলে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সালেহা এতক্ষন দরজার বাইরে থেকে তাদের কথা শুনছিল। মা চলে যেতে ছুটে এসে মকবুলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, স্যার আপনি কিছু করুন, নচেৎ আমি মরে যাব। এখানে আমার আর একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা করছে না।

মকবুল নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, তুমি এত ভেঙ্গে পড়ছ কেন? ধৈর্য্য ধর। ধৈর্য্যই হল সাফল্যের চাবি।

সালেহা বলল, আমি যে আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না স্যার। যদি আপনি কিছু না করেন, তাহলে প্রথমে দেশের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাকব। তারপর যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাব। এখানে আর ফিরে আসব না। আমি বাবা মার একমাত্র মেয়ে। আমাকে নিয়ে সংসারে এত অশান্তি। আমি তাদেরকে শান্তি দিতে চাই।

সব কিছু দেখে শুনে মকবুলের মন দিন দিন এদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ভাবল, এদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখা উচিৎ নয়।

মকবুল কিছু বলছেনা দেখে সালেহা অধীর কণ্ঠে বলল, চুপ করে আছেন কেন স্যার, কিছু বলুন।

মকবুল বলল, কি আর বলব, সব আমার ভাগ্য। আরো ধৈর্য্য

ধরার চেষ্টা কর। দেখা যাক কি করা যায়, এই বলে সে চলে এল।

এরপর মকবুল সালেহাদের বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু সালেহার মা কাজের মেয়ের হাতে ভাল ভাল খাবার করে তার বাসায় পাঠাতে লাগলেন।

সেদিনের পর থেকে মকবুল অফিসে ছাড়া বাসা থেকে কোথাও বার হয় না। সব সময় পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত রইল। তার ডিগ্রী পরীক্ষা নিকটে এসে গেছে। হাসিনাদেরকে ও পড়ান বন্ধ করে দিল।

কয়েকদিন পর হাসিনার মা ছোট মেয়ে ফরিদাকে পাঠালেন মকবুলকে ডেকে আনার জন্য।

ফরিদা এসে বলল, আপনি আর পড়াতে যাননি কেন? আপনার কিছু হয়েছে ভেবে আম্মা আমাকে পাঠাল। এক্ষনী আমার সঙ্গে যেতে বলেছে। কি যেন দরকার আছে।

মকবুল বলল, তুমি এখন যাও। আমি অফিস থেকে ফিরে বিকেলে যাব।

ফরিদা চলে যাবার পর মকবুল ভাবল, উনারা বোধ হয় সালেহাদের ব্যাপারটা জেনে গেছেন, তাই ডেকেছেন। গেলে যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন তাহলে কি উত্তর দেব? ঘড়ির দিকে লক্ষ্য পড়তে চিন্তাটা দূর করে দিয়ে উঠে পড়ল, অফিসে যাবার সময় হয়ে গেছে।

মকবুল অফিস থেকে ফেরার পথে হাসিনাদের বাসায় গেল। এদিক ওদিক চেয়ে হাসিনাকে দেখতে পেল না।

হাসিনার মা নাস্তা নিয়ে এসে বললেন, আপনি আর পড়াতে আসেন নি কেন? নিন আগে এগুলো খেয়ে নিন।

মকবুলের খেতে মোটেই ইচ্ছা হল না। কিন্তু মকবুল জানে উনি না খাইয়ে ছাড়বেন না। তাই বাধ্য হয়ে খেতে শুরু করল।

হাসিনার মা বললেন, আপনার চেহারা এত খারপ হয়ে গেল কেন? ভাল করে খাওয়া দাওয়া করেন নি বুঝি? সালেহার মা মকবুলকে তুমি করে বললেও হাসিনার মা আপনি করে বলেন। মকবুলকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললেন,

আপনি গোপন রাখলে কি হবে আমি সব শুনেছি। তাদের গণ্ডগোল মিটবে বলে মনে হয় না। সালেহার বাবা ঘর জামাই হয়ে থাকেন। যদিও তার সংসারে খবরদারি চলে না, তবু লোকটার খুব ডাঁট। আর টেরা প্রকৃতির। সালেহার মা ও নানি এই কাজ করতে চাইলে কি হবে উনি কিছুতেই রাজী হবেন না। আপনি ওদের ব্যাপার নিয়ে ভাববেন না। হাসিনা দুতিন দিন কেঁদে কেঁদে না খেয়ে ছিল। ওর নানি জানতে পেরে এসে নিয়ে গেছে। আপনাকে ও পাঠাতে বলেছে। আপনি ফরিদাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

মকবুল জিজ্ঞেস করল, হাসিনার কি কোন অসুখ করেছে?

হাসিনার মা বললেন, এমনি কোন অসুখ বিসুখ করেনি। জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না। এত করে বললাম, কি হয়েছে বল। কিছুতেই যদি মুখ খুলল। শুধু গুমরে গুমরে কাঁদে। আজকালের মেয়েরা পেটের কথা মুখে আনে না।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মকবুল মাগরিবের নামায পড়ার কথা বলে উঠে দাঁড়াল।

হাসিনার মা বললেন, নামায পড়ে আবার আসবেন কথা আছে।

মসজিদ থেকে নামায পড়ে এসে মকবুল পড়ার রুমে বসল।

কিছুক্ষণ পর হাসিনার মা এলে বলল, আপনারা যা কিছু শুনেছেন, তা আংশিক সত্য হলেও পুরোটা নয়। এ জন্যে দায়ী সালেহার নানি।

হাসিনার মা বললেন, সালেহার নানি দায়ী ঠিক কথা, কিন্তু তার মা খুব চালাক মেয়ে। তাই কাউকে জানতে না দিয়ে নিজে কাজ সমাধা করতে চেয়েছিলেন। এরকম যে বাধা আসবে তা ভাবতেই পারেন নি। আপনিও বাড়ীর লোভে তাদের ফাঁদে পা দিতে গিয়েছিলেন। ঢাকায় যাদের বাড়ী নেই, তাদের কি চলে না? আমার তো মনে হয় আপনি যে রকম ছেলে, আজ না হলেও একদিন না একদিন ঢাকাতে বাড়ী করতে পারবেন। আমিও সব সময় সেই দোওয়া করি। এখন ফরিদাকে নিয়ে আমার মায়ের বাসায় বেড়িয়ে আসেন। মনটা একটু হালকা হবে।

মকবুলের আর এদের কাউকে নিয়ে ভাবতে ভাল লাগল না। গোয়ালপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, মকবুলের অবস্থা তাই হয়েছে। ঢাকায় আসার পর থেকে এতগুলো মেয়েকে নিয়ে যে সব ঘটনা ঘটল, তারপরে আর ঐ পথে পা বাড়াতে সাহস হল না। যদিও হাসিনাকে সে সর্বান্তকরণে চায়। ভাবল, হাসিনাকে বিয়ে করতে রাজী হলে আবার হয়তো ভাগ্যের ফেরে কোন গোলমাল হবে। তার চেয়ে ওদের চিন্তা বাদ দেওয়াই উত্তম। ভাগ্যে যা আছে তাতো হবেই।

তাকে ভাবতে দেখে হাসিনার মা বললেন, চুপ করে আছেন কেন?

মকবুল বলল, দেখুন আমার পরীক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। পরীক্ষার পর না হয় একদিন বেড়াতে যাব।

হাসিনার মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ তাই যাবেন। তারপর তাকে ভাত না খাইয়ে ছাড়লেন না।

মকবুল সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে পরীক্ষার পড়ায় মন দিল। যথা সময়ে পরীক্ষা ও দিল।

পরীক্ষার পর মকবুল চিন্তা করল, আর পরের বাড়ী ঘরের আশা নয়। এবার নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করব না। এক বন্ধুকে দিয়ে সালেহা ও হাসিনাদের বাসায় পড়াতে পারবে না বলে খবর পাঠিয়ে দিল। ভুলেও সেদিকে আর পা মাড়াল না। ছোট খাট একটা ব্যবসা করার চিন্তা ভাবনা করল। পাশের মেসের একজনের সঙ্গে বেশ ভাবসাব হয়েছিল। সে ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির ব্রোকারী করে। তাকে ব্যবসা করার কথা বলতে সে বলল, যে কোন ব্যবসা করতে হলে প্রচুর টাকা পয়সা দরকার। আপনার তো অত টাকা নেই। আপাততঃ আমার সঙ্গে ব্রোকারী করুন। মকবুল রাজী হয়ে তার সঙ্গে কয়েকদিন থেকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচিত হল এবং ভালভাবে কাজটা বুঝে নিল। তারপর বন্ধুকে বলে নিজে আরম্ভ করল। অফিস

আওয়ারের পর ঐ কাজ করে বেশ আয় করতে লাগল।

তিন চার মাস পরে যেদিন রেজাল্ট বেরুল, সেদিন ক্লাস মেট শাহরিয়ারের কাছে গিয়ে রোল নাম্বার দিয়ে বলল, তুই তো রেজাল্ট জানতে ভার্সিটি যাবি, আমারটা ও জেনে আসবি?

শাহরিয়ারের সঙ্গে মকবুলের প্রথমে ক্লাস মেট হিসাবে পরিচয়। পরে সেটা বন্ধুত্বে পরিনত হয়। শাহিরিয়ার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। মকবুল অনেকবার তাদের বাড়ীতে গেছে।

শাহরিয়ার জিজ্ঞেস করল, তুই যাবি না?

মকবুল বলল, না, আমার যেতে খুব ভয় হচ্ছে। তুই তো জানিস পরীক্ষার আগে আমার মনের উপর দিয়ে কেমন ঝড় বয়ে গেছে। পরীক্ষার খাতায় কি লিখেছি না লিখেছি আমি নিজেই বলতে পারব না।

শাহরিয়ার ভার্সিটিতে গিয়ে রেজাল্ট জানল, দুজনেই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে। ফিরে এসে বলল, আগে রিক্সাভাড়ার খেসারত দে তারপর রেজাল্ট জানাব।

মকবুল ম্লান মুখে বলল, খেসারত যে দিতে হবে তা আগেই জানতাম। তোর খবর কি বল। তুই নিশ্চয় পাশ করেছিস?

শাহরিয়ার বলল, তুই মন খারাপ করছিস কেন? তুই ও পাশ করেছিস বলে রেজাল্টের কাগজটা দেখিয়ে বলল, আমার ধারণা ছিল তুই ফাস্টক্লাস পাবি। আফটার অল তুই তো আমার চেয়ে অনেক ভাল ছাত্র।

মকবুল শোকর আলহামদু লিল্লাহ বলে বলল, যদি ঐ রকম মানষিক বিপর্য্যয়ে না পড়তাম তাহলে হয়তো রেজাল্ট আরো ভাল হত।

শাহরিয়ার বলল, ভিতরে চল মাকে সালাম করব। ঘরের ভিতরে গিয়ে শাহরিয়ারের মাকে দুজনে রেজাল্টের কথা বলে কদমবুসি করল।

উনি তাদের দোওয়া করে বললেন, আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমরা ড্রইংরুমে বসে গল্প কর আমি আসছি। তারপর মকবুলকে বলললেন, তুমি না খেয়ে যেওনা।

ড্রইংরুমে এসে শাহরিয়ার বলল, তোর সব ঘটনা আমি জান। ওদের কথা ভেবে আর মন খারাপ করিস না। তুই যদি এখন বিয়ে করতে চাস, তাহলে বল। আমার আত্মীয়দের মধ্যে ওদের চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে যাকে তোর পছন্দ হবে, তার সঙ্গে ব্যবস্থা করব।

মকবুল বলল, ওসব কথা এখন থাক। আমি এখন আর বিয়ের কথা চিন্তা করি না।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে শাহরিয়ার বলল, চল গুলিস্তান সিনেমায় "একই অঙ্গে এতরূপ" বই দেখি। শুনেছি বইটা নাকি খুব ভাল।

ঃ আমি সিনেমা দেখি না।

ঃ ও তুই তো আবার মোল্লা। সে কথা আমার মনেই ছিল না। তা এবার কি করবি ভেবেছিস?

ঃ তোকে পরে জানাব বলে মকবুল সেখান থেকে বাসায় ফিরে এল। অফিসের কয়েক দিনের ছুটিতে মকবুল বাড়ীতে এল। মাসে মাসে বাবাকে টাকা পাঠালেও সে খুব কম বাড়ীতে আসে। তাও যেদিন আসে তার পরের দিন ঢাকা চলে আসে। সংসারের কোন খোঁজ খবর রাখত না। এবারে কয়েক দিন থেকে বুঝতে পারল, সংসারের প্রতি খেয়াল না করে অনেক ভুল করেছে। তার মনে হল, একটু চেষ্টা করলে সংসারটার উন্নতি করা যায়। তাই এবারে ঢাকায় ফিরে এসে নিজের খর-চের মত রেখে রোজগারের সব টাকা প্রতি মাসে বাড়ীতে গিয়ে আব্বার হাতে তুলে দেয়। কি করে সংসারে উন্নতি হবে, আব্বার সঙ্গে আলোচনা করে। মকবুল আপ্রান চেষ্টা করতে লাগল, কি করে তাদের পরিবার গ্রামের প্রথম শ্রেণীর পরিবারে মত হতে পারে। কিন্তু ভাই ভাবীদের কলহের কারণে সেখানে ও মকবুল ব্যর্থ হল। আব্বা ইদানিং একবিঘে একটা ভাল ধানি জমি ছোট ভাইয়ের নামে রেজেস্ট্রী করে দিতে মকবুলের মন খুব ভেঙ্গে গেল। আব্বা মনে কষ্ট পাবে বলে মকবুল মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে আব্বাকে কিছু বলল না। শেষে মকবুল চিন্তা

করল, আব্বার জমি জায়গা, ভিটে-বাড়ীর আশা না করে নিজেকে কিছু করতে হবে। কিন্তু এতদিনে বেতন কিছু বাড়লেও তা দিয়ে এবং ব্রোকারী করে সামান্য যা রোজগার হয়, সেই টাকায় তার আশা পূরণ হয় না। মনের দুঃখে দিন কাটাতে থাকে। একদিন মকবুলের এক ফুপাতো বড় ভাই জামাল তার কাছে আসেন। আপ্যায়নের পর মকবুল জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া, কি মনে করে এলেন?

জামাল বললেন, এমনি বুঝি কেউ কারো কাছে আসে না?

মকবুল বলল, আসবে না কেন? তারা বেড়াতে আসে। আপনার মত ব্যবসাদার লোক আসেন না। মকবুলের এই ফুপাতো ভাই তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। উনার হাজিগঞ্জে চালের আড়ৎ আছে।

জামাল হেসে উঠে বললেন, তুই তো বেশ বুদ্ধিমান দেখছি। তোর কথাই ঠিক। কয়েক দিন আগে আমি বলিয়া গিয়েছিলাম। মামা তোর জন্যে মেয়ে দেখেতে বললেন। আমাদের ওখানে একটা সুন্দর মেয়ে আছে। আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি। তোর ভাবী মেয়েটাকে চেনে। তার নাম ইয়াসমীন। আমার মুখে মামীর কথা শুনে তোর ভাবী ঐ মেয়েটার কথা বলে বলল, মকবুলের সঙ্গে ইয়াসমীনকে খুব ভাল মানাবে। ইয়াসমীন দেখতে শুনতে যেমন ভাল, তেমনি স্বভাব চরিত্র। তোর ভাবী তোকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে।

মকবুল বলল, আমি এখন বিয়ে করব না। সংসারটাকে ভাবীরা নরক বানিয়ে রেখেছে। বিয়ে করে আর একটা মেয়েকে ঐ নরকে ফেলতে চাই না। আমার ইচ্ছা বিয়ে করার আগে নিজে আলাদা একটা থাকার ব্যবস্থা করব।

জামাল বললেন, তোর কথা অবশ্য ঠিক। তবে কি জানিস, সব কিছু নিজের কাছে। নিজে ঠিক থাকলে সব ঠিক। ঐ যে একটা প্রবাদ বাক্য আছে-"আপ ভালা তো দুনিয়া ভালা।" তাছাড়া তোর বয়স হয়েছে। আর দেরী করা উচিৎ না। বেশী বয়সে বিয়ে করলে সংসারে খুব অশান্তি আসে। আমার কথা শোন,

বিয়ের পর অনেকের ভাগ্য খুলে যায়। আর সংসারের কথা যে বললি, সে ব্যাপারে এক কাজ করতে পারিস, বিয়ের পর বৌকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসবি।

ফুপাতো বড় ভাইয়ের জেদাজেদীতে মকবুল তার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে রওয়ানা দিল।

মকবুলের এই ফুপাতো ভাইয়ের বাড়ী তাদের বাড়ী থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে হাজিগঞ্জের পাশেই ডমরু গ্রামে। ঐ গ্রামে তাদের আরো আত্মীয় আছে। কিন্তু ভিলেজ পলিটিক্সের কারণে তাদের সঙ্গে মিলমিশ নেই। তাই কেউ কারো বাড়ীতে বড় একটা যায় না।

মকবুল ফুপাতো ভাইয়ের বাড়ীতে আসার পরের দিন তার ভাবী মেয়েটাকে আনিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর বলল, তোমরা দুজনে কথা বল। আমি নাস্তা নিয়ে আসি বলে বেরিয়ে গেল।

মকবুল মেয়েটার আপাদমস্তক চেয়ে চেয়ে দেখাতে লাগল। শালওয়ার কামিজ পরনে। গায়ে ও মাথায় ওড়না দেওয়া। দেখতে মোটামুটি। বেশ গোলগাল চেহারা। রংটা ফর্সাই বলা চলে।

মেয়েটা লজ্জায় মাথা নিচু করে বসেছিল। মকবুলের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখচোখ পড়ে যেতে আবার মাথা নিচু করে নিল।

মকবুল জিজ্ঞেস করল, আপনার নামটা জানতে পারি?

ঃ সাবিনা ইয়াসমীন। সবাই ইয়াসমীন বলে ডাকে।

ঃ বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো? লেখাপড়া কতদূর করেছেন?

ঃ গত বছর এস, এস, সি, পরীক্ষা দিয়েছি।

ঃ আর পড়াশুনা করলেন না কেন?

ঃ বড় ভাইয়া পড়াতে রাজী নন।

ঃ আপনার আব্বা কি বলেন?

ঃ উনি চার পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন।

ঃ আমার নাম জানতে ইচ্ছা করছে না?

কথা বলতে বলতে ইয়সামীনের একটু সাহস হয়েছে। লজ্জা ভাবটা ও কেটেছে। মকবুলের দিকে চয়ে বলল, জী করছে।

ঃ মকবুল হোসেন। নামটা কেমন বলুন তো।

ঃ খুব সুন্দর।

ঃ আপনারটা আরো বেশী সুন্দর এবং সেই সঙ্গে আপনিও।

ইয়াসমীন নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?

ঃ আপনি ও তাই বলছেন।

ঃ আপনার কথা আমি ভাবীর কাছে অনেক শুনেছি। আপনি সব দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বড়। বড়কে আপনি করে বলাই তো উচিৎ। আমাকে তুমি করে বললে খুশী হব।

মকবুল বুঝতে পারল, মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমান। জিজ্ঞেস করল, আমার কথা তো অনেক শুনছ বললে, দেখে কি রকম মনে হচ্ছে?

ঃ যা শুনেছি তার চেয়ে বেশী দেখলাম

ঃ সেটা ভাল না খারাপ?

ঃ ভাল।

ঃ মন রাখার জন্যে বলছ না তো?

ঃ তা কেন? যা সত্য তাই তো বলা উচিৎ।

ঃ শুনে খুশী হলাম। কিন্তু অনেক সময় মানুষের বাইরেটা দেখে শুনে বিচার করলে ঠকতে হয়।

ঃ আপনার কথা কিছুটা সত্য হলেও পুরোটা নয় । কারণ মানুষের আসল সরূপ বাইরে চেহারা ও কার্য্যকলাপ দেখে ভালমন্দ বোঝা যায়।

ঃ তুমি এসব জানলে কি করে?

ঃ ধর্মীয় বই পড়ে।

ঃ তাহলে ধর্মের অনেক কিছু জান?

ঃ অনেক কিছু না জানলে ও কিছু কিছু জানি।

ঃ যা জেনেছ সেগুলো কি মেনে চল?

ঃ প্রত্যেক মুসলমানের তা মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য,

ঃ আমিতো ধর্মের অনেক কিছু জানি না আর মেনেও চলি না।

সবকিছুর সঙ্গে সেটাও নিশ্চয় শুনেছ?

ঃ ঠিকমত নামায রোজা করেন শুনেছি। আর কিছু শোনার দরকার মনে করি নি। কারণ যারা আলাহকে ভয় করে এবং রসুল (দঃ) কে ভালবাসে, তারাই ঠিকমত রোজা-নামায আদায় করে।

ঃ অনেকে ঠিকমত নামায রোজা আদায় করে শুনাম অর্জনের জন্যে। আবার অনেকে নিজেদের গর্হিত কাজ ঢাকা দেবার জন্য ঐসব করে।

ঃ আপনার কথা অস্বীকার করছি না। তবে দেখা গেছে, একদিন না একদিন ঐ নামায রোজা তাদেরকে ঐ সব গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এরকম ঘটনা আগে ও ঘটেছে আর এখানো ঘটছে। আপনি কোরানের ব্যাখ্যা পড়েছেন কিনা জানি না, আমি পড়েছি। আল্লাহ পাক কোরানের বিরাশী জায়গায় শুধু নামায পড়ার কথা বলেছেন। তাছাড়া ও বলেছেন, একমাত্র নামাযই মানুষকে অসৎ পথ থেকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

মকবুল ভাবল, মেয়েটা ধার্মীক। একে বিয়ে করলে হয় তো সে আমার এই দগ্ধিভূত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে পারবে। বলল, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম। অনেক প্রশ্ন করে বিরক্ত করলাম, সে জনে ক্ষমা চাইছি।

ইয়াসমীন বলল, একি, ক্ষমা চাইছেন কেন? একজন অন্যজনকে জানতে হলে পরিচয় ও আলাপ আলোচনার মধ্যেই তো জানা যায়। আমিও আপনার সঙ্গে কথা বলে বেশ আনন্দ পেলাম। এখন আসি তা হলে?

এসো বলে মকবুল তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।

ভাবী তাদেরকে আলাপ করার সুযোগ দিয়ে নাস্তা তৈরী করছিল। সেগুলো নিয়ে আসার সময় ইয়াসমীনেক ঘর থেকে বোরোতে দেখে বলল, আরে ভাই চলে যাচ্ছ কেন? নাস্তা খেয়ে যাও।

ভাবীর সঙ্গে ইয়াসমীনের অনেক দিন থেকে ভাবসাব।

ইয়াসমীন প্রায়ই তার কাছে এসে গল্প করে। পাড়া সুবোদে তারা ননদ ভাজ। বলল, না ভাবী আমি এখন নাস্তা খাব না। একটু আগে খেয়েছি।

ভাবী বলল, খেয়েছ তো কি হয়েছে? নাস্তা বারা বার খাওয়া যায়। এসো এসো নাস্তা না খাইয়ে ছাড়ছি না।

বাধ্য হয়ে ইয়াসমীন তার সঙ্গে রুমে এসে বসল।

ভাবী তাদেরকে নাস্তা পরিবেশন করে নিজেও নিল।

মকবুল বলল, ভাইয়াকে দেখছি না কেন?

ভাবী বলল, কিছুক্ষন আগে কোথায় যেন গেল। এক্ষুনী হয়তো এসে পড়বে।

এমন সময় জামাল এসে বললেন, কি ব্যাপার আমাকে ছাড়াই তোমরা যে নাস্তা খেতে লেগে গেছ।

ভাবী নাস্তার প্লেট তার দিকে এগিয়ে দেবার সময় বলল, মকবুল এক্ষুনী তোমার কথা বলছিল।

নাস্তা খাবার পর ইয়াসমীন চুপি চুপি পালিয়ে গেল।

ভাবী মকবুলকে জিজ্ঞেস করল, ইয়াসমীনকে কেমন লাগল বল।

মকবুল বলল, শুধু ছেলের মত নিলে হবে ভাবী, মেয়েরও তো একটা মতামত আছে?

ঃ তা আছে সেটা আমাদের উপর ছেড়ে দাও। তোমারটা বল।

ঃ ভালকে তো আর খারাপ বলতে পারব না। মেয়েটা সত্যিই ভাল। আলহামদুলিলাহ বলে ভাবী স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, বলেছিলাম না, ইসয়ামীনকে দেখলে তোমার ভাইয়ের অপছন্দ হবে না। তারপর মকবুলকে বলল, তাহলে তোমার ভাইয়া মামা মামীকে খবরটা জানাক।

ভাবীর কথা মকবুলের কানে গেল না। সে তখন নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করছে। যাকেই সে ভাল মনে করে পছন্দ করে, তার সঙ্গে বিয়ের কথা উঠলেই বাধার সৃষ্টি হয়ে ভেঙ্গে যায়।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভাবী বলল, কি হল, কিছু বলছ

না কে?

মকবুল সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, কি যেন বলছিলে?

ভাবী বলল, এত কাছে থেকে আমার কথা তা হলে শুনতে পাওনি? মনে হচ্ছে ইয়াসমীনের কথা চিন্তা করছিলে?

মকবুল লজ্জা পেয়ে বলল, না তা ঠিক নয়, অন্য কথা ভাবছিলাম কি বলছিলে বল।

ভাবী বলল, এবার তাহলে তোমার ভাইয়া মামা মামীকে ও মেয়ের বড় ভাইকে তোমার মতামত জানিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলুক?

মকবুল বলল, সে তোমরা যা বুঝো করো। আমি আজ বিকেলে ঢাকা চলে যাব, কাল আমাকে অফিসে যেতে হবে। সেই দিন দুপুরে খাওয়ার পর মকবুল ঢাকায় ফিরে এল।

ইয়াসমীনের বড় ভাই কায়সার ঢাকায় একটা সরকারী স্কুলে মাষ্টারী করেন। তিনি একদিন মকবুলের অফিসে এসে তার সঙ্গে দেখা করেন এবং সব কিছু খোঁজ খবর নেন। মকবুল তাকে আপ্যায়ন করিয়ে বিদায় করে।

আট

দুমাস পর মকবুল বাড়ীতে এল।

মা নূরবানু স্বামীকে বললেন, মকবুল এবার যাতে সংসারী হয় তার ব্যবস্থা করুন। কিছুদিন আগে জামাল মকবুলকে যে মেয়ে দেখিয়েছিল, তার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

নোয়াব আলি বললেন, তার আগে আমি নিজে ডমরু গিয়ে মেয়ে দেখব। স্ত্রীর তাগিদে পরদিন তিনি বড় বোনের বাড়ী ডমরু রওয়ানা দিলেন।

মকবুল ইয়য়ামীনকে দেখে যাবার কয়েকদিন পর জামালের ছেলের সঙ্গে ইয়াসমীনের এক ভাইয়ের কোন এক কারণে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়ে পরে বেশ মারামারি হয়। গ্রাম্য সালিশীতে জামালের ছেলের দোষ প্রমাণিত হয় এবং জামালকে জরিমানা বাবদ বেশ কিছু টাকা দিতে হয়। এই ঘটনার পর ইয়াসমীনের গার্জেনরা বিয়ের ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে সাহস করতে পারেন নাই। আর জামাল ও বড় একটা গা করেন নি।

এর মধ্যে নোয়াব আলি ইয়াসমীনকে দেখতে এবং বিয়ের কথাবার্তা বলার জন্য ডমরু এসে হাজির হলেন।

উনি যখন জামালদের বাড়ীর সদরে এসে পৌছালেন, তখন তার চাচাতো ভাই হায়দার উনাকে খাতির করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তারপর আপ্যায়নের পর্ব শেষ করে কথার্বাতার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন, মকবুল যে মেয়েকে কিছুদিন আগে দেখে গেছে সেই ব্যাপারে এসেছেন। একথা জানতে পেরে হায়দার চিন্তা করলেন, যাদের সঙ্গে মারামারির

ঘটনাকে কেন্দ্র করে জরিমানা দিতে হল, সেই ঘরের সঙ্গে আত্মিয়তা করা ঠিক হবে না। উনার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। নোয়াব আলির কথায় বুঝতে পেরেছেন তিনি এই মারামারি ও জরিমানার কথা জানেননি। হায়দার মনে মনে একটা বুদ্ধি খাটালেন. ইয়াসমীনের মেজ চাচার মেয়ে রুবীর সঙ্গে মকবুলের বিয়ে দিতে পারলে ওদের নিজেদের ঘরে আগুন জ্বলবে। ভাবলেন, তা যদি করতে পারি, তাহলে আমাদের অপমানের প্রতিশোধ উসুল হবে।

রুবী ইয়াসমীনের সমবয়সী। একটু সাদা সিদে ধরনের মেয়ে। দেখতে ইয়াসমীনের চেয়ে খারাপ। রোগা লম্বা শরীর। সে এবারে ক্লাস টেনে পড়ছে। তার বাবার অবস্থা তেমন ভাল নয়। ভাইয়েরা সব আলাদা। ইয়াসীমন ও কায়সার মেজে ভাইয়ের ছেলে মেয়ে। কায়সারের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তিনি গ্রামের মাতবর।

হায়দার ঐ সব চিন্তা করে নোয়াব আলিকে জামালের বাসায় যেতে দিলেন না। তিনি একদিকে যেমন জামালের চাচাতো ভাই, জামালের মামা নোয়াব আলি তেমনি হায়দারের এক সম্পর্কে চাচা হন। উনাকে বললেন, চাচা যে মেয়েকে মকবুল দেখে গেছে তার চেয়ে হাজারগুন ভাল একটা মেয়ে আমার কাছে আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। কোরান পড়তে জানে। নানা রকম হাতের কাজে ও পটু। দেখতে শুনতে ভাল। ক্লাস টেনে পড়ে। খুব পর্দা নসীন। আমার মনে হয় চাচা, আপনি যে মেয়েকে দেখতে এসেছেন তারচেয়ে এই মেয়ে অনেক ভাল।

নোয়াব আলি সাদাসিধে মরুব্বী মানুষ। হায়দারের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন না । বললেন, তুমি যখন নিজের লোক হয়ে এই কাজ ভাল হবে মনে করছ তখন আমি আর কি বলব? তুমি যা ভাল বুঝ কর। তবে তার আগে জামালের সঙ্গে দেখা করলে হত না?

হায়দার বললেন, তার সঙ্গে দেখা পরে করবেন। আগে আপনি এই মেয়ে দেখুন।

এমন সময় জামালের স্ত্রী মামা শ্বশুরকে নিয়ে যাবার জন্য এসে ভাল মন্দ জিজ্ঞেস করে বলল, আমাদের ঘরে চলুন। সে বেশ কিছুক্ষন আগে মামা শ্বশুরের আসার খবর পেয়ে উনার অপেক্ষায় ছিল। স্বামী বাড়ীতে নেই, হাজিগঞ্জ দোকানে। তাই মামা শ্বশুর এতক্ষণ আসছেন না দেখে সে নিজে নিয়ে যেতে এসেছে।

ভাগ্নাবৌকে নোয়াব আলি বললেন, তুমি যাও আমি কিছুক্ষণ পরে আসছি।

জামালের স্ত্রী চলে যাবার পর হায়দার নোয়াব আলিকে নিয়ে বাজারে গিয়ে নানান কৌশলে সময় কাটাতে লাগলেন। যাবার সময় নিজের মনের উদ্দেশ্যের কথা স্ত্রীকে বলে গেলেন, তুমি রুবীর বাবা মাকে ব্যাপারটা বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝিয়ে বলবে আর তাদের আত্মীয়দেরকে খবর দিয়ে আনতে বলে রুবীকে সাজিয়ে রাখতে বলবে। আমি চাচাকে নিয়ে সন্ধ্যের পর মেয়ে দেখতে যাব। হাঁ এব্যাপারে তারা যেন এখন ইয়াসমীনদের বাড়ীর কারো সঙ্গে আলাপ না করে। কায়সার তো বাড়ীতে নেই। ঢাকায় আছে। বাজারের মসজিদ থেকে মাগরিবের নামায পড়ে এসে হায়দার স্ত্রীকে কত দূর কি হল খবর নিতে পাঠালেন। উনি ফিরে এসে বললেন, সবাই এসে পৌঁছায় নি। এশার নামাযের পর একটু রাত করে যেতে বলেছে।

রুবীর বাবা মাকে যখন হায়দারের স্ত্রী ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন তখন উনারা আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবটা মেনে নিলেন। রুবীর বাবা শওকাত খুব সরল লোক। হায়দারের ও তার স্ত্রীর কৌশল বুঝতে পারলেন না। ভাল ঘরের ভাল ছেলে পেয়ে তিনি আনন্দে আটখানা হয়ে ভাল মন্দ চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করলেন না। তিনি হায়দারের স্ত্রীর কথামত কাজে লেগে গেলেন।

রাত দশটার দিকে হায়দার নোয়াব আলিকে নিয়ে রুবীদের ঘরে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে তারা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। নোয়াব আলি প্রথমে খেতে বেশ আপত্তি করলেন। শেষে হায়দারের অনুরোধে খেলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর মেয়ে দেখিয়ে উনারা মতামত জানতে চাইলেন।

মেয়েকে দেখে নোয়াব আলির তেমন পছন্দ হল না। হায়দারের কথার সঙ্গে অনেক মিল নেই। কিন্তু এত কিছুর পর মেয়ের এবং তার আত্মীয় স্বজনের সামনে কি করে বলবেন, মেয়ে পছন্দ হয়নি। তাই একরকম অনিচ্ছা সত্বে ও হ্যাঁ বলে মত প্রকাশ করলেন।

হায়দার তখন নোয়াব আলিকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কত দিন বাড়ীতে থাকবে?

নোয়াব আলি বললেন, কাল বাড়ীতে থাকবে পরশু ঢাকা চলে যাবে।

হায়দার বললেন, কাল শুক্রবার আছে কাবিন হয়ে যাক। পরে অনুষ্ঠান করে তুলে নেবেন।

নোয়াব আলি কিছু বলার আগে তারা সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের গায়ে হলুদ দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর রাত বারটার সময় নোয়াব আলিকে বিদায় দিলেন।

বাড়ীতে এসে মুখে হাতে পানি দিয়ে মকবুলকে ডেকে বল-লেন, আগামী কাল জুম্মার আগে বাজার মসজিদে তোমার বিয়ে হবে। আমি সেই রকম পাকাপাকি কথা দিয়ে এসেছি।

মকবুল জিজ্ঞেস করল, কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে?

নোয়াব আলি বললেন, তুমি যে মেয়েকে দেখেছিলে তার বড় চাচার মেয়ের সঙ্গে। সেই মেয়ের চেয়ে এই মেয়ে অনেক ভাল।

মকবুল বজ্রাহতের মত চমকে উঠে বলল, এ আপনি কি বলছেন আব্বা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। একই বাড়ীতে এক ভাইয়ের মেয়ে দেখে অন্য ভাইয়ের মেয়েকে কি করে বিয়ে করতে যাব?

নোয়াব আলি বললেন, তাতে কি এমন অসুবিধে? এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। তা ছাড়া সেখানে কোন পাকা কথা হয়নি।

মকবুল বলল, তবু সেখানাকার লোকজন কি বলবে ভেবে

দেখেছেন?

নোয়াব আলি বললেন, তাদের বলাবলিতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমি থাকাতেই তারা মেয়ের গায়ে হলুদ দিয়েছে। এরপর আর আমার কিছু করার ছিল না।

মকবুল বলল, তা না হয় মানলাম, কিন্তু যে মেয়েকে আমি দেখলাম না তাকে কেমন করে বিয়ে করব? তা ছাড়া আমার মতামত না নিয়ে এতদূর অগ্রসর হওয়া আপনার ঠিক হয় নাই।

সেখানে মকবুলের মা নূরবানু ছিলেন। তিনি স্বামীকে বললেন। মকবুল ঠিক কথা বলেছে। ও যে মেয়েকে দেখে পছন্দ করে এসেছে, তার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করতে গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে পাকাপাকি করতে গেলেন কোন হিসাবে? আর এত তাড়াতাড়িই বা করতে গেলেন কনে? তারাই বা হুট করে মেয়ের গায়ে হলুদ দিতে গেল কেন? তার উপর মেয়েটা আবার সেই মেয়েটার চাচাতো বোন। নিশ্চয় এর মধ্যে তাদের কোল চাল আছে। আপনি জামালের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন?

স্ত্রীর কথায় নোয়াব আলি যেন ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে বলে মনে করলেন। বললেন, মেয়ের গার্জেনরাই যখন তাড়াতাড়ি করে সব কিছু করল তখন আমি আর কি বলব। আমি তো জামালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে হায়দার চালাকি করে আমকে দেখা করতে দেয়নি।

নূরবানু বললেন, আমার কথা হল তো? আপনি জামালের সঙ্গে দেখা না করে খুব ভুল করেছেন।

আম্মাকে আব্বার সঙ্গে কথা বলতে দেখে মকবুল নিজের রুমে ফিরে এসে সারারাত নিজের ভাগ্যকে নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। মালা, লিলি, সামীনা বানু, হাসিনাও সালেহার কথা একের পর এক তার মনের পাতায় ভেসে উঠল। এক সময় তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল।

সকালে মকবুল মাকে বলল, লোক পাঠিয়ে ওদেরকে জানিয়ে দাও, এ বিয়ে হবে না।

নূরবানু বললেন, এ বিয়েতে আমারও মত নেই। কিন্তু তোর আব্বার মান সম্মানের দিকে চেয়ে বলছি, তুই অমত করিস না। ঐ বাড়িতে আমাদের পুরোনো আত্মীয়তা। তুই বিয়ে না করলে তোর আব্বার মান সম্মান যেমন ধূলোয় মিশে যাবে তেমনি মেয়ের বাপ চাচাদের সঙ্গে চিরকালের জন্যে শত্রুতা লেগেই থাকবে। তুই শিক্ষিত ছেলে হয়ে তাই কি চাস? তোর আব্বা নিজের ভুল বুঝতে পেরেও নিজেদের বংশের ইজ্জতের কথা চিন্তা করে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারছেন না। তোর উপর আমাদের বংশের মান ইজ্জৎ নির্ভর করছে। তুই রাজী হয়ে যা বাবা।

মায়ের কথা মুনে মকবুল পূর্বাপর সবকিছু চিন্তা করে মনের জ্বালা মনে চেপে রেখে বলল, আমার আর রাজী অরাজীর কি আছে? কোরবানীর গরু তাজা হলেই বা কি আর না হলেই বা কি? নিয়েত যখন করেই ফেলেছ তখন তোমরা তোমাদের কাজ কর।

নূরবানু ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়ের কেনাকাটা করার জণ্য বাজারে পাঠালেন।

মকবুল ভারাক্রান্ত মনে মায়ের কথামত বাজার করে নিয়ে এল। তখন ছিল আষাঢ় মাস। সারাদিন মুষলধরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় দিন পার হয়ে গেল। সন্ধ্যের পর বৃষ্টি একটু কমতে মকবুল একজনকে পাঠিয়ে বাজার থেকে নৌকা ভাড়া করে আনাল।তারপর বৃষ্টির মধ্যে জনা পাঁচেক লোক নিয়ে রাত দশটা এগারটার দিকে রওয়ান দিল।

মকবুল যে বাড়ীতে বিয়ে করতে যাচ্ছে সেই বাড়ীর চারপাশে খাল আছে। যে কোন দিক দিয়ে ঐ বাড়ীতে উঠা যায়। ওদের নৌকা প্রথমে জামালের ঘরের কাছে ভিড়ে। মকবুল সবাইকে নিয়ে তার ঘরে উঠল।

জামাল ঘরে নেই মকবুল ভাবীর কাছে কি বাবে এরকম উল্টো ঘটনা ঘটল, জানতে চাইল।

ভাবী তাকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বলল।

এদিকে কনে পক্ষ সংবাদ পেয়ে তাদের আত্মিয় স্বজনসহ এসে বর ও বর যাত্রীদের এখানে উঠার কারণ জিজ্ঞেস করা নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু করল। পরে ভীষণ ঝগড়াতে লিপ্ত হল। ততক্ষণে জামাল ও এসে গেছেন। তার সঙ্গেও ভীষণ ঝগড়া বেধে গেল।

মকবুল সব কিছু বুঝতে পেরেও তার করার কিছু রইল না। কোন রকমে ঝগড়া থামিয়ে নিজেদের লোকজন নিয়ে আবার নৌকায় উঠল। তারপর সদরে যেখানে বিয়ের মজলিস করা হয়েছে সেখানকার ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে মজলিশে এল।

সেখানে ও নানান লোক নানা রকম কথা বলাবলি করতে লাগল। বিশেষ করে ইয়াসমীনের গার্জেনরা বর ও বরযাত্রীদের যা তা মন্তব্য করে অসম্মান জনক কথা বলতে লাগল যাতে করে বর ও বরপক্ষ অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ফেরৎ চলে যায়। কনে পক্ষ দুর্বল থাকায় তাদেরকে বাধা দিতে পারল না। না খেয়ে না দেয়ে সমস্ত রাত অপমানের জ্বালা মকবুলদের সবাইকে সহ্য করতে হল। ফজরের নামাযের কিছু আগে কোন রকমে বিয়ের কাজ সমাধা হল। ফজরের নামায পড়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু মকবুল খেল না। সে বাজারে গিয়ে হোটেলে নাস্তা খেয়ে জামালের দোকানের গদীতে শুয়ে পড়ল। একে দুশ্চিন্তা তার উপর অভুক্ত ও বিনিদ্র রজনীর পর তার দুচোখে ঘুম ভেঙ্গে এল। সে গভীর ঘুমে অছন্ন হয়ে পড়ল

এদিকে কনের গার্জেনরা জামাইকে খোঁজা খুঁজি করে না পেয়ে ভাবল, কোথাও হয়তো গেছে এসে পড়বে। সারাদিন অপেক্ষা করে যখন জানতে পারল, সে জামালের দাকানে আছে তখন প্রায় সন্ধ্যে। কনের বড় ভাই সেখানে গিয়ে মকবুলকে বাড়ীতে নিয়ে আসতে চাইল।

মকবুল যেতে অস্বীকৃতি জানাল।

জামাল তাকে বুঝিয়ে বললেন, তুই যদি অন্য কোনখানে থাকিতস, তা হলে কোন কথাছিল না। সারাদিন আমার কাছে থেকে এখন যদি না যাস, তা হলে তোর শ্বশুরদের সঙ্গে আবার ভীষণ ঝগড়া সৃষ্টি হবে।

মকবুল কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যেতে রাজী হল। সামাজিক প্রথা মত বাজার থেকে পান, সুপারী, জর্দা ও মিষ্টি ইত্যাদি কিনে শ্বশুর বাড়ী গেল। খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় বসে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত প্রায় এগারটার সময় রুবীর বড় ভাবী মকবুলকে ঘুম থেকে উঠিয়ে অজু করে দুরাকাত শোকরানার নামায পড়তে বলল। নামায পড়ার পর সেই ভাবী মকবুলকে একটা রুমে রেখে চলে গেল।

মকবুল রুমে ঢুকে দেখল, রুবী খাটের উপর ঘোমটা দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে । সে দরজা লাগিয়ে এগিয়ে এসে খাটের একপাশে বসল। কিছুক্ষন চুপচাপ বসে থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে রুবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন তার মনে হল, কোথায় মালা, লিলি, সামিনাবানু, হাসিনা ও সালেহা, আর কোথায় কালো, রোগা ও অসুন্দর রুবী? এর থেকে তবু ইয়াসমীন অনেক ভাল ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের কথা ভেবে মকবুলের চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। আর সেই সঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল "ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস।" মকবুলের বিবেক বলে উঠল, সুখ শান্তি ভাগ্যে না থাকলে কেউ পেতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের উচিৎ ভাগ্যকে স্বীকার করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এরপর মকবুল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তোমার নাম কি?

মকবুল ঘোমটা খুলে সরিয়ে দিতে রুবী লজ্জা পেয়ে এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল। সেই অবস্থাতেই বলল, তাসলিমা বেগম। ডাক নাম রুবী।

মকবুল তার চিবুক ধরে মুখটা তুলে ভাল করে দেখতে গেলে রবী তার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, প্রথম রাতে স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে হলে তাকে কিছু দিতে হয় জানেন না বুঝি?

মকবুল বলল, জানি। তুমি জান কি না পরীক্ষা করলাম। এখন বল, তুমি আমাকে চাও, না টাকা চাও।

ঃ আমি দুটোই চাই।

ঃ দুটো দিতে পারব না, যে কোন একটা চাও।
ঃ বারে তা কি করে হয়? সব মেয়েই দুটো চায়।
ঃ সব মেয়েদের কথা বাদ দাও, তোমারটা বল।
ঃ প্রথম রাতেই এ রকম একগুঁয়েমি করছেন কেন? আপনার স্বভাবই এই রকম নাকি?
মকবুলের মন এমনিই খারাপ। তার উপর রুবীকে দেখে এবং তার কথার্বাতা শুনে আরো খারাপ হয়ে গেল। তার সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছা করল না। তার খুব ঘুম পাচ্ছিল। একটা হাই তুলে বলল, তুমি যখন যে কোন একটা নিতে চাচ্ছ না তখন আর কি করি, আমাকে ঘুম পাচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ি। কথা শেষ করে সে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল।
রুবী কিছুক্ষন তার দিয়ে চেয়ে থেকে যখন বুঝতে পারল, সে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সেও তার পাশে ঘুমিয়ে পড়ল।
মকবুলের যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত তিনটে। দেখল রুবী তাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভাবল, যা কিছু হয়েছে তা আমার ভাগ্য। একে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?
স্বামী জেগে গেছে জানতে পেরে রুবী সেই অবস্থাতে থেকে বলল, স্বপ্ন জ্ঞানের জন্য আমি আপনার মনে কষ্ট দেয়েছি, মাফ করে দিন।
মকবুল বুঝতে পারল, সেই থেকে রুবী জেগে জেগে কাঁদছে। স্ত্রীর প্রতি তার মন ব্যথায় টনটন করে উঠল। তাকে দুহাতে জড়িয়ে বুকের উপর তুলে নিয়ে আদের সোহাগ করতে করতে বলল, আমার বেশী জ্ঞান থাকা সত্বেও তোমার সঙ্গে এই শুভরাতে ঐ রকম ব্যবহার করা উচিৎ হয় নি। সে জন্যে আমিও তোমার কাছে ক্ষমা.....
রুবী স্বামীকে কথাটা শেষ করতে দিল না, তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, ওরকম কথা বলে আমাকে গোনাহগার করবেন না। তারপর সে স্বামীর আদর সোহাগের প্রতিদানে মেতে উঠল।

মকবুল স্ত্রীর আদর সোহাগে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। জীবনে প্রথম যুবতী স্ত্রীর গভীর আলিঙ্গন ও আদর সোহগ পেয়ে তার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের মত শীহরণ খেলতে লাগল। যৌবনের প্রথম উন্মাদনা সহ্য করতে পারল না। ফলে যা হবার তাই হল।

রুবীর ও মকবুলের মত অবস্থা। প্রথমে একটু ভয় পেয়ে বাধা দিলে ও পরে নিজেকে স্বামীর আলিঙ্গেনে সঁপে দিল।

সকালে নাস্তা খাওয়ার পর নিজের লোকজনদের ফিরে যেতে বলে ওখান থেকে অফিস করার কথা বলে ঢাকা চলে এল।

এর পরের ঘটনা অনুভূতিশীল হৃদয়বানদের জন্য আরো করুন। মকবুল প্রায় দুমাস পরে বাড়ীতে এল। রুবীকে তার পছন্দ না হলেও ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে যে পুরুষ একবার নারীদেহ ভোগ করেছে, সে তা বারবার ভোগ করার জন্য পাগল হয়ে উঠে। লজ্জার ক্ষাতিরে মকবুল এতদিন অনেক কষ্টে ছিল। বাড়ীতে এসে মাকে বলল, তোমরা বৌ তুলবে না?

নূরবানু বললেন, তোর আব্বা তো বৌ তুলবে বলে ডমরু গিয়েছিলেন। তারা তোর নামে অনেক দুর্নাম দিয়েছে। তুই নাকি অনেক আগে ঢাকায় বিয়ে করেছিস। তোর চরিত্র খারাপ। কলেজে পড়ার সময় কত মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা করেছিস। তোর শ্বশুর বাড়ীর লোকজন তোর আব্বাকে ঐ সব বলে অপমান করে বলেছে, তারা মেয়ের ঘর করাবে না।

মকবুল শুনে ভীষণ রেগে গেল। আব্বার কাছে গিয়ে বলল, আম্মা আমার শ্বশুর বাড়ীর কথা যা কিছু বলেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনি কি কিছু চিন্তা ভাবনা করেছেন?

নোয়াব আলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি কি আর চিন্তা ভাবনা করব? যা করার তুমি করবে। তোমার চাচাতো বড় সম্বন্ধি কায়সার, যার বোনকে তুমি আগে দেখেছিলে, সে ঢাকায় চাকরি করে। সে না কি ঢাকাতে তোমার সম্বন্ধে সবকিছু জেনে এসে তোমার শ্বশুরকে ঐ সব বলেছে। তারা বোধ হয় মেয়েকে ঘর করাবে না। আমি তাদেরকে অনেক বোঝালাম, মকবুল আমার ছেলে। সে এরকম কাজ কখনো

করতে পারে না। কেউ হয়তো দুযমনি করেছে। কিন্তু তারা আমার কথা না শুনে যা তা কথা বলে অপমান করেছে। তুমি সেখানে গেলে তোমাকে ও অপমান করার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। এখন তুমি চিন্তা করে দেখ কি করবে।

মকবুল রুবীকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে খুশী না হলেও ভাগ্যের কথা স্মরণ করে তাকে নিয়েই জীবন কাটাতে মনস্থ করেছিল। এখন আব্বার কথা শুনে মনে যেমন খুব কষ্ট পেল তেমনি রেগে গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আমার কি মনে হয় জানেন আব্বা, আমি কায়সার ভাইয়ের বোনকে বিয়ে না করে তার চাচাতো বোনকে বিয়ে করেছি বলে সেই হিংসায় এবং হায়দার ভাইয়ের পলিটিক্স বুঝতে পেরে তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য এই চাল চেলেছেন। যদি তিনি এতে কৃতকার্য্য হন, তাহলে একদিকে যেমন হায়দার ভাইকে ও আমার শ্বশুরকে জব্দ করা হবে, অন্যদিকে আমাদেরকে দশ জনের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারবে। আমি জেনে শুনে এতবড় অন্যায় সহ্য করব না। আমি জামাল ভাইয়ের কাছে গিয়ে এর একটা বিহীত করবো।

নেয়াব আলি বললেন, তারা যখন মেয়ের ঘর করাতে চাচ্ছে না তখন আর ওসব কিছু করার দরকার নেই। তুমি বৌকে তালাক দিয়ে দাও। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি তোমার আবার বিয়ে দেব।

মকবুল বলল, আব্বা আপনি এরকম চিন্তা আর করবেন না। বৌকে তালাক দেওয়া চলবে না। তা হলে ওরা আবার জিতে যাবে। আর আমরা হেরে যাব। সবাই ভাববে, ঘটনা সত্য। তাই ভয়ে মেয়েকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। দশ গ্রামের মানুষ ও তাই মনে করবে। তখন আমাদর মান সম্মান যেটুকু আছে তাও ধু-লোয় মিশে যাবে। আমি জামাল ভাইয়েয় সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার শ্বশুর বাড়ীতে জানিয়ে দেব, তারা যদি তাদের মেয়েকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তা হলে ভাল, নচেৎ মান হানির কেস করে বুঝিয়ে দেব কতধানে কত চাল

নোয়াব আলি বললেন, তারাও শাসিয়েছে, যদি তুমি তাদের

মেয়েকে তালাক না দাও তবে কায়াসরের নাকি কোন পুলিশ সুপারের সঙ্গে জানাশুনা আছে তাকে দিয়ে এ্যারেস্ট করাবে।

মকবুল বলল, তাই না কি? তাহলে আমিও ছেড়ে কথা বলবো না। তাদেরকে জানিয়ে দেব, কায়সার ভাইয়ের পুলিশ সুপারের সঙ্গে জানাশুনা থাকলে আমার ও এক মিনিষ্টারের সঙ্গে জানাশুনা আছে। তাকে দিয়ে সবাইকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব। দেখলেন তো, আমি তখন বলেছিলাম না, এই বিয়ে ভেঙ্গে দাও। নিশ্চয় এর ভিতর ভিলেজ পলিটিক্স আছে। এখন হলো তো? আমার কথা না শুনে আমাদের মান সম্মান পাঁচ গ্রামের মানুষের কাছে বাড়ছে না ধূলোয় মিশে যাচ্ছে?

নোয়াব আলি বললেন, আর ওসব কথা বলো না। আমার একটু ভুলের জন্যে তোমার যে ক্ষতি করলাম, তা সারা জীবনে ও পূরণ করতে পারব না। তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন, আমার মনে হয় তোমার সেখানে যাওয়া উচিৎ হবে না।

মকবুল বলল, আপনি ওসব নিয়ে কিছু ভাববেন না। যা কিছু করার আমি করব।

পরের দিন মকবুল ঢাকায় ফিরে এল। আসবার সময় মকবুল গোপনে হাজিগঞ্জ বাজারে জামাল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে তার শ্বশুরদেরকে যা জানাবার সবকিছু বলে এসেছে।

কিছুদিন পর জামালের মাধ্যমে মীমাংসার ব্যবস্থা হল। মকবুল আব্বাকে ও গ্রামের কিছু গণ্যমান্য লোকজন নিয়ে ডমরু এল। উনারা কমিশনার চেয়ারম্যান ও একজন এম. পি.কে নিয়ে মীমাংসায় বসলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক বাকবিতণ্ড ও শাসানি বেশ কিছুক্ষণ চলল। তারপর যখন মেয়ে পক্ষের লোকজন ও মেয়ের বাবা বুঝতে পারলেন, এত কিছুর পর তাদের মেয়ের বিয়ে আর কখনো কোথাও দিতে পারবে না তখন এম, পি, কমিশনার ও চেয়ারম্যানদের কথা মত মীমাংসা মেনে নিলেন। উনারা একমাস পরে মেয়েকে নায়ারে পাঠাবার দিন স্থির করলেন।

এরপর মকবুল সেই স্ত্রীকে নিয়ে এখানো ঘর সংসার করছে।

কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক তা নেই। একে একে হাসিনার ও সালেহার বিয়ে হয়ে যাবার কথা শুনে আর নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে চোখের পানি ফেলে। সালেহার বিয়ে কোথায় কার সঙ্গে হল মকবুলের খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে না বলে নেয় না। তবে হাসিনার নিয়েছে। এক ধনী ব্যবসায়ী হাসিনাকে দেখে তার বাবা রাজমিস্ত্রী জেনে ও এবং যৌতুক না নিয়ে বিয়ে করেছে। হাসিনা এখন ঢাকার বুকে ছয়তলা বাড়ীওয়ালা ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী। সে ঐ সব পেয়ে কতটা সুখী হয়েছে এবং মকবুলের মত তার মনে কোন দুঃখ আছে কিনা মকবুল তা জানে না. সে সব কথা ভাবতে গিয়ে মকবুলের প্রথম প্রেম মালার কথা মনে পড়ে। তার স্মৃতিও তাকে কম পীড়া দেয় না। তাকে নিয়ে মকবুল অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তার বিয়ের কথা শুনে সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। এইচ এস, সির পরীক্ষার সময় নিকটবর্তী ছিল বলে তার জন্য কিছুই করতে পারে নাই। তাদের কাছ থেকে চলে আসার সময় মালা চিঠিতে সে বদ দোওয়া করেছিল, মকবুলের তা প্রায় মনে পড়ে "আমার জন্য যদি কিছু আপনি না করেন, তবে চিরকাল অশান্তি আগুনে জ্বলবেন।" লিলির মায়ের অভিশাপের কথাও মকবুলের বার বার মনে পড়ে। তার মনে হয় ওদের সকলের অভিশাপের জণ্য হয়তো সে জীবনে কোনদিন শান্তির মুখ দেখতে পাবে না। আব্বার দুটো কাজও মকবুলের মনে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। বৃটিশ আমলের স্কলারশিপ নিয়ে এন্ট্রাস পাশ করা জ্ঞানী, গুণী ও ধার্মিক লোক হয়ে কি করে এমন কাজ করলেন, তার কারণ আজ ও মকবুল ভেবে পানি। প্রথমটা হল মকবুলের বিয়ের আগে বাড়ীর কাছে একটা ভাল এক বিঘে জমি ছোট ভাইয়ের নামে লিখে দেওয়া। অথচ মকবুলের উপার্জনে যত জমি কেনা হয়েছে, সব চার ভাইয়ের নামে। অবশ্য ঐ জমিটা উনার পৈত্রিক। আর দ্বিতীয়টা হল, সব জেনে শুনে কি করে এই মেয়ের সঙ্গে মকবুলের বিয়ে দিলেন। যার ফলে মকবুল আজও শশুর বাড়ী কি জিনিস জানে না। শশুর

বাড়ীর লোকেরা তাকে জামাই বলে সম্মান করে না।
ঢাকায় মেসে থেকে আজও মকবুল চাকরি করছে। স্ত্রী নিয়ে ঘর সংসার করছে। কিন্তু স্ত্রী তাকে কতটা ভালবাসে, কি চোখে দেখে, স্ত্রী তাকে স্বামীর মর্য্যদা দেয় কিনা, তাকে স্বামী হিসাবে পেয়ে সুখী হয়েছে কিনা কোন কিছুই বোঝার বা জানার চেষ্টা সে করেনা। মকবুল হাজিগঞ্জ টাউনে একটা বাড়ী করেছে। সেখানে স্ত্রী দুতিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে। গ্রামে কিছু জমি জমা আছে। ঢাকা শহরে চাকরি আছে। রাজধানীতে পাঁচতলা বাড়ী করার মত একটু জমি ও আছে কিন্তু নেই তার মনে একবিন্দু শান্তি। রাতে ঘুমোতে গিয়ে সব সময় শুধু একটা কথাই মনে পড়ে অতগুলো মেয়ের অভিশাপ কি বিফলে যায়? তাদের মনে দুঃখ দিয়েছি বলে তার মনে কোন শান্তি নেই। আর জীবনে কোনো দিন পাবে কি না জানে না। তাদের কারো না কারো অভিশাপ নিশ্চয় আল্লাহ পাক কবুল করেছেন। তাই মকবুলের হৃদয় চিতার আগুনের মত জ্বলছে। কবে যে সে আগুন নিববে তা মকবুল জানে না। স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে হাজিগঞ্জের বাড়ীতে সুখ শান্তিতে আছে কিনা মকবুল কোনদিন খোঁজ নিয়ে দেখিনি। সে ঢাকায় মেসে থেকে চাকরি করছে। নিয়মিত দেশের বাড়ীতে গিয়ে ঘর সংসার দেখাশুনা করছে। আর মনকে দুটো কথা বলে প্রবোধ দেয়। তার প্রথমটা হল, "ম্যান প্রোপোজেস গড ডিসপোজেস।" আর দ্বিতীয়টা হল, "লাভ ইজ অলওয়েজ টিয়ার্স।"

সমাপ্ত